শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

১

২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

বর্ষ—১৫ সংখ্যা—১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

মায়ের প্রার্থনা	
মানুষের উপকার	শ্রীমা
নববর্ষের পূর্বমুহূর্তে	"
অকম্পটতা	"
ঈশোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ
দিব্য-জীবন	অনির্বাণ
নির্ভর (কবিতা)	মিশিকান্ত
সুধমুখী	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়

মূল্য—১৲ টাকা

84-'55-500

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

১

কোন মানুষী ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত টিকবে না।

এস, আমরা স্বেচ্ছাক্রমে অনন্তভাবে ভগবানের পক্ষে গিয়ে দাঁড়াই পরিণামে জয় হবেই নিশ্চয়।

শ্রীমা

শ্রীমা

श्रीमा

৮

মায়ের প্রার্থনা

সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯১৪

নির্বাক লেখনী, তোমার চির-সান্নিধ্যের স্মৃতি করতে গিয়ে। ভগবান, তুমি যেন রাজা, তোমার রাজ্যের পূর্ণ দখল তুমি নিয়ে নিয়েছ। এখন প্রত্যেকটি প্রদেশ তুমি সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বাড়িয়ে তুলছ ; ঘুমন্তকে জাগিয়ে ধরছ, জড়ত্বের দিকে ঝোঁক যাদের তাদের সক্রিয় করে তুলছ, মনস্তকে সুসঙ্গত করে ধরেছ—একদিন আসবে যখন এই সুসঙ্গতি পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে উঠবে, তখন সমস্ত সাম্রাজ্যটি তার জীবন-ধারার ভিতর দিয়ে হয়ে উঠবে তোমার মুখপাত্র, তোমারই আত্মপ্রকাশ।

সেদিনের অপেক্ষায়, ভগবান, লেখনী নির্বাক তোমার সান্নিধ্যের স্মৃতি করতে গিয়ে।

সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯১৪

ভগবান, মনের সব জঞ্জাল তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ, উপলব্ধি দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ প্রসারে। কোন দৃষ্টিভঙ্গিই ভুললে চলবে না, প্রত্যেকটিকে ধরে তার সিদ্ধিতে সোজা গিয়ে পৌঁছতে হবে, কোনটি বাদ দিয়ে রাখলে হবে না। পথে গতি যাতে বিলম্বিত হয়ে যায় এমন দীমা এমন ছেদ টেনে দিলে চলবে না—তুমি এসে সাক্ষাৎ দাঁড়িয়েছ ঠিক এই কাজেই সাহায্য করবার জন্যে। যারা সব হল তুমি নিজে, যারা প্রকাশ করে তোমাকে—এক একটি বিশেষ ধারায় পূর্ণতা নিয়ে—তারাই আমাদের সহকর্মী। এই ত তোমার ইচ্ছা।

ভগবতী জননী রয়েছেন আমাদের পাশে, তিনি কথা দিয়েছেন পরাৎপর অখণ্ড চেতনার সঙ্গে—অতল গভীরতা থেকে বাহ্যতম ইন্দ্রিয়-জগৎ অবধি সমস্তের সঙ্গে—আমরা থাকব একীভূত হয়ে। আর এ সকল জগতেই অগ্নিদেব তাঁর পাবকশিখা নিয়ে আমাদের সহায় হবেন, বীর্য্য সব সমিদ্ধ করে, সঙ্কল্প সব সফল করে ধরবেন সিদ্ধি যাতে সত্বর আসে। ইন্দ্রদেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জ্ঞানের জ্যোতি যাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর সোম-

দেব আমাদের রূপান্তরিত করে ধরেছেন পরম আনন্দের উৎস তাঁর অসীম অদ্বিতীয় অপরূপ প্রেমের মধ্যে।

ভাগবতী মধুময়ী জননী! বাক্যাতীত সমাহিত প্রীতি নিয়ে অপরিসীম নির্ভর নিয়ে প্রণতি জানাই তোমায়।

ভাস্বর অগ্নিদেব! এত জীবন্ত তুমি আমাদের অন্তরে! তোমায় যখনি আহ্বান করি, আবাহন করি যাতে তুমি আরো জীবন্ত হয়ে ওঠ, যাতে তোমার বেদিকুণ্ড আরো বৃহৎ হয়ে ওঠে, শিখা সব আরো প্রবল, আরো ঊর্দ্ধমুখী হয়ে ওঠে, যাতে সমস্ত সত্তাটি হয় এক অনন্ত লহন, এক শক্তিপ্লুত হবন।

ইন্দ্রদেব! তোমায় পূজা করি, তোমায় প্রশস্তি করি, আকুল প্রার্থনা করি যাতে তুমি আমার সঙ্গে এক হয়ে থাক, যাতে সকল বন্ধন তুমি নিঃশেষ দূর করে দাও, দাও আমায় তোমার দিব্য-জ্ঞান।

হে পরম প্রেম! তোমাকে আমি কখন অন্য নাম দেই নাই, তুমিই যে সর্ব্বতোভাবে আমার অন্তরাত্মার সার-সত্তা, আমি অনুভব করি তোমাকে, আমার প্রতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণুর মধ্যে তুমি স্পন্দিত, যেমন অনন্ত বিশ্বের মধ্যে আর তার বাহিরেও, সকল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তুমিই প্রবাহিত, সকল ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে তুমিই তাদের কেন্দ্র, সকল সদিচ্ছার ভিতরে তুমিই প্রোজ্জ্বল, সকল দুঃখকষ্টের পিছনেও তুমিই রয়েছ প্রচ্ছন্ন, তুমিই আমার ধর্ম্ম, অনুরক্ত তার অনুষ্ঠান, তুমিই তা একাগ্র হয়ে চলেছে—আমি যেন উত্তরোত্তর অনুভব করতে পারি যে সত্যসত্যই আমি সর্ব্বতোভাবে তুমিই হয়ে উঠেছি।

আর তুমি, প্রভু আমার, এ সবই তুমি সম্মিলিতভাবে এবং অধিকন্তু আরো। অধিতীয় অধীশ্বর তুমি, রয়েছ আমাদের চিন্তার শেষ সীমানায়, যজ্ঞাতের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছ আমাদের জন্যে, সেই অচিন্ত্যের থেকে প্রকট করে নিয়ে এস নূতন জ্যোতি কিছু, ঊর্দ্ধতর পূর্ণতর সিদ্ধির একটা সম্ভাবনা, যাতে তোমার বুভু সংসিদ্ধ হয়, যাতে বিশ্ব আরো এক পা এগিয়ে যেতে পারে তোমার সঙ্গে সমুচ্চ একত্বের দিকে, সেই মহা-আবির্ভাবের দিকে।

এখন লেখনী আমার নির্ব্বাক, তোমায় আরাধনা করি নীরবতার মধ্যে।

অক্টোবর ৫, ১৯১৪

তোমার ধ্যানে, প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে, যে সর্ব্বেশ্বর, প্রকৃতি ফিরে আবার নিজেকে শক্ত করে সবর্ব করে তোলে; ব্যক্তিগত মাত্রা সব অতিক্রম করে সে ডুবে যায় তোমার

আনন্তোর মধ্যে যেখানে যাবতীয় ভুবনের এমন ঐক্য-উপলব্ধি যাতে বিশৃঙ্খলা নাই অব্যবস্থা নাই। যে বস্তুর উদ্বর্তন হয়, যার হয় ক্রম-বিবর্তন, যা আছে শাশ্বত-কালে তাদের সুসঙ্গত সম্মেলন ধীরে গড়ে ওঠে সেখানে নিরন্তন ক্রম-সমৃদ্ধ ক্রম-প্রশমিত, ক্রম-সমুচ্চ ঐশ্বর্য্যকে আশ্রয় করে। জীবনের ধারাত্রয় তাদের পরস্পরের আদানে-প্রদানে তোমার আবির্ভাবকে পূর্ণ করে তোলে।

বহুলোকে তোমাকে আজ খোঁজে—দুঃখকষ্টের, অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়ে। তাদের কাছে আমি যেন হয়ে উঠতে পারি তোমার প্রতিভূ, যাতে তোমার আলো তাদের আলোকিত করে, তোমার শান্তি তাদের প্রশান্ত করে ধরে।

এ-সত্তাটি তোমার কর্ম্মের একটি অবলম্বন, তোমার চেতনার একটি কেন্দ্র।

কোথায় গেল সব সীমা বাধা। তোমার রাজ্যের তুমিই একচ্ছত্র রাজা।

*

অক্টোবর ৬, ১৯১৪

মা মধুময়ী! আমায় শিখিয়ে দিতে হবে, কি করে সর্ব্বতোভাবে সদাসর্ব্বদা আমি তুমি হয়ে উঠতে পারি, নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারি এই কাজে যাতে প্রকাশোন্মুখ সৎ-বস্তুটি ক্রমে লাভ করে তার সুষ্ঠুতর প্রকাশ-যন্ত্র।

সবই প্রশান্ত প্রসন্ন, সংঘর্ষ নাই, বেদনা নাই—এমন কি, আশৃহা অবধি, বিপ্লুত হয়ে উঠেছে, তীব্রতা না হারিয়েও, কিন্তু রয়েছ তুমি শান্তিপূর্ণ। ঠিক একই সময়ে আমি চেতনার মধ্যে একটা অদ্ভুত বৈপরীত্যের ফলে—জিনিষের সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগের মত—সত্তা অনুভব করছে একদিকে অখণ্ড সৎ-বস্তুর সেই অচল প্রশান্তি যার মধ্যে নিখিল প্রতিষ্ঠিত সকল পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা অতিক্রম করে, অন্যদিকে বিশ্বসম্ভূতির তীব্র ক্ষিপ্র গতি, একটা নিরবচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতি-ধারা আশ্রয় করে।

উভয়েই সমান সত্য তোমার কাছে, হে ভগবান।

*

অক্টোবর ৭, ১৯১৪

আলো যেন ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর উপর, [illegible] যেন বিরাজ করে সকল হৃদয়ে।...

প্রায় সকলে জানে কেবল সেই জীবন যা স্থূল জড় ভারগ্রস্ত, পরিবর্ত্তনবিমুখ, তামসিক; তাদের প্রাণশক্তিও জীবনের এই বাহ্যরূপে এত আসক্ত যে দেহের বাহিরে নিজের ধারায় মুক্তি পেলেও সে ব্যাপৃত থাকে কেবল দুঃখ কষ্টে ভরা দৈনন্দিন স্থূল নৈমিত্তিক ব্যাপার নিয়ে। আর

যাদের মধ্যে মানসিক জীবন জাগ্রত হয়েছে, তারা হল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বিক্ষুব্ধ, স্বেচ্ছাচারী, প্রভুত্বপ্রয়াসী ; যে সব পরিবর্তনের পুনঃসংস্কারের স্বপ্ন তারা দেখে তার দুর্নিপাকের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তারা ব্যস্ত কেবল ধ্বংস করবার জন্যে, কি-বস্তুর উপর দাঁড়িয়ে যে গড়তে হবে আদৌ তা না জেনে—তাই তাদের আলো হল যেন চোখ ধাঁধান মিথ্যালোক, বিশৃঙ্খলা তাতে বেড়েই যায়, দূর হয় না।

তোমার ধ্যানে রয়েছে যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, তোমার অক্ষয় আনন্দের যে স্থির দৃষ্টি, তারই অভাব সকলের মধ্যে।

এই বাষ্টিসত্তাটির উপর তোমার পরম করুণা, অসীম কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাই সে প্রার্থনা করে, হে ভগবান, যেন ঠিক এই বর্তমানের আলোড়নকে আশ্রয় করে, এই অপরিসীম বিশৃঙ্খলতার ভিতরেই ঘটে যত্যাশ্চর্য্য ঘটনা—যেন তোমার পরম প্রশান্তির তোমার নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ জ্যোতির বিধান সকলের প্রত্যক্ষ হয়, তারই শাসন মেনে চলে যেন তোমার চেতনায় নব-জাগ্রত মানুষের পার্থিব প্রকৃতি।

মধুময় হে ভগবান। প্রার্থনা তুমি শুনেছ, এই আশ্বাসে সাড়াও তুমি দেবে।

•

অক্টোবর ৮, ১৯১৪

—কর্মের মধ্যে যে আনন্দ তার প্রতিপূরণে, তার সাধারক্ষা করে অন্যদিকে সকল কর্ম-নিবৃত্তির মধ্যে যে হরির আনন্দ—এ দুটি অবস্থা আধারের মধ্যে যখন পর্য্যায়ক্রমে দেখা দেয় কিম্বা যুগপৎ চেতন হয়ে ওঠে, তখনই আনন্দের পূর্ণমাত্রা, কারণ তোমার পরিপূর্ণতা সেখানে। ভগবান! তুমি আমাকে দিয়েছ নিরাধারে অফুরন্ত ধ্যান-ধারা, তোমার আনন্দে পূর্ণ প্রশান্তি ; আমার আমায় একান্ত করে ধরেছ সর্বসিদ্ধিদাত্রী মাতা-ভগবতীর সঙ্গে যাতে আমি সদাজাগ্রত থাকতে পারি, কর্ম করে চলতে পারি তাঁর পরমাশক্তির অংশরূপে।

তোমার আনন্দের সর্বশক্তিময় আনন্দে ভরপুর হয়ে তোমাকে প্রণতি জানাই।

মানুষের উপকার

শ্রীমা

যারা পূর্ণযোগের সাধনা করে কেবল জনহিতেই তাদের লক্ষ্য হতে পারে না, তা হতে পারে একটা পরিণাম বা ফল মাত্র। অনেক উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং নিষ্ঠা নিয়ে মানুষের দুরবস্থা দূর করার বহু চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সেসব পরিণত একান্ত ব্যর্থতায়, কারণ মানুষের অবস্থার রূপান্তর হতে পারে আর একটা আভ্যন্তরীণ রূপান্তর দ্বারাই, মানুষের চেতনার রূপান্তর—রূপান্তর অন্তত সেই বিশেষ ব্যক্তিদের, অল্প সংখ্যক হলেও যারা ব্যাপকতর রূপান্তরের ভিত্তি স্থাপনা করতে সক্ষম হবে।

বিষয়টির আমরা আলোচনা করব পরে—উপসংহারে ; প্রথমে, খাটি জনহিতৈষী-দের মধ্যে থেকে দুটি জলন্ত দৃষ্টান্তের কথা বলব।

চিন্তা ও কর্মের দুই চরম বিপরীত প্রান্ত থেকে দুই ব্যক্তি—দয়ার্দ্র এবং স্পর্শালু চিত্ত নিয়ে দুটি সেরা লোক—মানুষের দুঃখবেদনার সংস্পর্শে এসে অন্তরাত্মায় একই আঘাত পেয়ে-ছিল। দুজনেই তাদের সহধর্মী জীবের এই দুঃখ দূরীকরণের উপায় আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিল এবং দুজনেরই বিশ্বাস ছিল সে-উপায়ের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন। দুটি সমাধানই—বলা যায়, দুটি বিপরীত সমাধানই—ব্যর্থ হয়েছে, কারণ দুটিই অসম্পূর্ণ এবং আংশিক সমাধান : মানুষের দুঃখকষ্টের লাঘব হয়নি।

প্রথম দৃষ্টান্ত প্রাচ্য থেকে—রাজকুমার সিদ্ধার্থ, পরে বুদ্ধ বলে পরিচিত; দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য থেকে—নর্সিয় ভাঁসাঁ, মৃত্যুর পরে সাঁ ভাঁসাঁ দ্য পল (Saint Vincent de Paul) বলে আখ্যাত : দুজনে ধরে দিয়েছেন মানব চেতনার দুই প্রান্ত যেন। দুজনের নিরাময়-পদ্ধতিও যেন পরস্পরের ঠিক বিপরীত। অথচ দুজনেই বিশ্বাস করতেন মুক্তি সম্ভব আত্মার মধ্যে দিয়ে, চিন্তার অতীত নিত্যসত্যের মধ্যে দিয়ে : একজন তাকে বললেন 'ভগবান', আর একজন 'নির্বাণ'।

সেন্ট ভাঁসাঁ দ্য পলের ছিল জলন্ত বিশ্বাস, শিষ্যদের বলতেন তিনি—সবপ্রথম আপন আত্মাকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু মানুষের দুঃখদৈন্যের সংস্পর্শে এসে তিনি আবিষ্কার করলেন যে আত্মাকে জানতে হলে তার জন্য অবসর থাকা চাই যারা উদ্‌ভ্রান্ত এবং প্রায়শ অন্ত থেকে উদর পর্যন্ত সামান্য এক মুঠি অন্নের জন্য জীবনান্ত পরিশ্রম করে তাদের আত্মার কথা চিন্তা করবার সময় কই? সুতরাং দয়ার্দ্র হৃদয় তিনি সরলমনে সিদ্ধান্ত করলেন যে ধনিকরা যদি তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামগ্রী ত্যাগের দ্বারা দরিদ্রদের নিতান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের

প্রয়োজন মেটায় তবে দরিদ্রেরা উন্নততর জীবন যাপনের একটা অবকাশ পায়। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজসেবার কাজে, স্থূল এবং দৈনন্দিন স্তরে। তিনি ভেবেছিলেন ব্যক্তিগত নিরাময়ের সংখ্যা বাড়িয়ে, বৃহত্তর সংখ্যায়, যতদূর সম্ভব বৃহত্তর সংখ্যায় তাদের নিরাময় করে তুলনেই দুঃখদুর্দ্দশার সমাধান। বলা বাহুল্য, এ হল সাময়িক উপশম মাত্র, রোগের সমাধান এতে হয় না। যে আত্ম-নিবেদন যে-আত্ম-ত্যাগ নিয়ে কাজ করেছিলেন তিনি তা তাঁকে ইতিহাসে এক সুন্দর চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি দিয়ে এঁকে রেখেছে। কিন্তু তবু মনে হয় তাঁর প্রয়াস দুঃস্থ ও দুর্গতদের সংখ্যা না কমিয়ে যেন বাড়িয়েই দিয়েছে। তবে তাঁর শিক্ষার আসল প্রত্যক্ষ ফল হল যে তা এক শ্রেণীর ধনীদের মনে এনে দিয়েছে দানের প্রেরণা। এই কারণে তাঁর কাজ গ্রহীতাদের চেয়ে দাতাদের পক্ষেই বেশী উপকারী হয়েছিল।

চেতনার আর এক প্রান্তে হলেন বুদ্ধ—শুষ্ক সঙ্কুচিত করুণার মূর্ত্তি। তাঁর কাছে জীবন অর্থই দুঃখ, সে-দুঃখের অবসান জীবনের অবসানে, কারণ জীবন ও পৃথিবী আসে জীবনের স্পৃহা থেকেই, তারা হল অজ্ঞানের ফল। বাসনার শেষ কর, অজ্ঞানকে দূর কর, দুঃখ-দৈন্য সহ পৃথিবীও মিলিয়ে যাবে। একটা বিপুল আধ্যাত্মিক আস্পৃহা এবং নীরব সমাহিতির দ্বারা মুক্তিকামীদের জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন এই মহান ফলবান এক ঊর্দ্ধমুখী সাধনা।

লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, যদিও কার্যত তাকে ফলিয়ে ধরেছে এমন লোকের সংখ্যা তাদের মধ্যে কমই। এসব সত্ত্বেও মানুষের অবস্থা রয়ে গিয়েছে যথাপূর্ব্বং, তার দুঃখ-দুর্দ্দশার বোঝা তাদের তেমন কিছুই হ্রাস হয়নি।

তব কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার বশবর্তী হয়ে মানুষ একজনকে "বুদ্ধ" (ভাগবত) এবং অপর জনকে ভগবান আখ্যা দিয়েছে। এই শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত আন্তরিকভাবে জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছে এমন লোকের সংখ্যা ছিল কম, যদিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হতে পারত তা-ই। সে-দৃষ্টান্ত কার্যত অনুসরণ করা হলেও কিন্তু মানুষের অবস্থার তেমন ইতর-বিশেষ হত না। কষ্ট লাঘব আর নিরাময় করা এক নয়, পলায়ন করা আর জয় লাভ এক নয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ পলের সমাধান—পার্থিব দুঃখ-দৈন্যে সেবা করা—মানুষকে দুঃখ দুর্দ্দশা থেকে মুক্ত করতে পারে না, কারণ মানুষের সব দুঃখ কষ্ট শুধু স্থূলভাব থেকেই আসে না, তাদের সমাধানও শুধু স্থূল উপায়েই নয়। বরং বিপরীত। দৈহিক স্বস্তির সঙ্গে যে শান্তি ও আনন্দ আসবেই তা বলা চলে না; দারিদ্র্য অর্থই দুঃখ নয়, যুগে যুগে নানা দেশে দেখা গিয়েছে এমন অনেক সাধু-সন্ন্যাসী যারা দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও আস্বাদ করেছেন শান্তি ও আনন্দ। তেমনি অপর দিকে পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য-ভোগও—পার্থিব সম্পদ এনে দেয় যে আরাম, বিলাস এবং স্থূল তৃপ্তি সে-সবকিছুও—মানুষকে দুঃখ শোকের আঘাত থেকে বাঁচাতে পারে না।

অন্য সমাধানটি, বুদ্ধের সমাধানটি,—তা হল পালিয়ে যাওয়া, তাতে সমস্যার বাস্তবিক সমাধান কিছু হয় না। তর্কের খাতিরে যদিও স্বীকার করে নিই যে বহু লোক এ ধর্ম অনুসরণ করতে পারে, পৌঁছুতে পারে মুক্তি-নক্ষত্রে, তবু তাতে পৃথিবীর বিপুল দুর্দশা মিলিয়ে যায় না, নিষ্কৃতি হয় না মানব সাধারণের—অগণিত মানব সাধারণ নির্বাণের পথে চলতে অপারগ।

বুদ্ধের সেই সুখই যথার্থ সুখ যা সকল অবস্থাতেই অনুভব করা যায়, কারণ তা আসবে এমন সব স্তর থেকে যারা অবস্থা যাদের স্পর্শ করতে পারে না। তবে এই সুখ অতি অল্প লোকের অধিগম্য, অধিকাংশ রয়েছে পার্থিব বন্ধার অবরুদ্ধনে। তাহলে একদিকে আমরা বলতে পারি, মানুষের চেতনার একটা পরিবর্তন অপরিহার্য প্রয়োজন, আবার অন্য দিকে বলতে পারি, পৃথিবীর আবহাওয়ায় একটা সমূহ রূপান্তর না এলে মানুষের অবস্থার কোনো কার্যকরী পরিবর্তন হতে পারে না। উভয়ত্র একই সমাধান একটা চেতনার আবির্ভাব যুগপৎ পৃথিবীর উপর এবং মানুষের মধ্যে। যে যন্ত্রণা বেদনা দুর্দশার অতলে তলিয়ে আছে মানুষ তার থেকে তাকে টেনে তুলতে হলে চাই অতিমানস চেতনার অবতরণ আর তার সঙ্গে এক নূতন শক্তি, আলো এবং সামর্থ্যের প্রকাশ। কারণ এই পৃথিবীর উপর একটা নূতন উন্নততর স্থিতি এবং সত্যতর ও শুদ্ধতর জ্যোতি নামিয়ে এনে একমাত্র অতিমানস চেতনাই পারে রূপান্তরের এই অভাবনীয় মহাঘটনাটি সম্ভব করে তুলতে।

প্রকৃতি চলেছে এই নূতন অভিব্যক্তির প্রকাশের দিকে। তবে তার পথ কুটিল, গতি অনিশ্চিত, কখনো থেমে কখনো পিছিয়ে চলে সে—তাই তার কোনো সদর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবু একথা ক্রমেই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে সে চায় মানুষের মধ্যে থেকে গড়ে তুলতে এক নূতন জীব, এক অতিমানস জাতি—মানুষের সঙ্গে তার পার্থক্য ততখানি যতখানি পার্থক্য মানুষ আর পশুর মধ্যে। কিন্তু এই রূপান্তরের, এই নবজাতি সৃষ্টির পথে লাগতে পারে শত শতাব্দীর পরীক্ষা এবং অন্ধ প্রয়াস; অথচ এই জিনিষটিই মানুষের সচেতন ইচ্ছা সম্পন্ন করতে পারে শুধু অল্প সময়ের মধ্যেই নয়, অনেক ক্ষতি এবং অপচয় বাঁচিয়েও।

এইখানেই হল পূর্ণযোগের প্রয়োজন এবং সার্থকতা। যোগ অর্থই হল তীব্র একাগ্রতা ও প্রয়াসের ফলে সেই সব পদে পদে বিলম্বনের বাধা অক্লেশে পার হয়ে যাওয়া যা মহাকাল এই আমূল রূপান্তর এবং নবসৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছে।

পূর্ণযোগ এই পৃথিবীকে তার দুর্ভাগ্যের কাছে চিরতরে ফেলে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে চলে যাওয়া নয়। তার অর্থ আবার নয় বর্তমাকার কোনো পরিবর্তনের কোনো আশা নেই বলে গ্রহণ করা এই স্থূল জীবন, ভাগবত ইচ্ছার চরম প্রকাশ বলে গ্রহণ করা এই বর্তমান জগতকেই।

পূর্ণযোগের লক্ষ্য সাধারণ মানস চেতনা থেকে অতিমানস ও দিব্য চেতনা পর্যন্ত সকল ধাপ পার হয়ে যাওয়া, আর এই আরোহণ শেষ যখন তখন জড়জগতে নেমে আসা, সেখানে এই অধিকৃত অতিমানস শক্তি চেতনার অনুপ্রবেশ করান যাতে এই পৃথিবীই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে উঠতে পারে অতিমানস ও দিব্য জগতে।

পূর্ণযোগ বিশেষ করে তাদেরই জন্যে যারা মানুষের লভ্য সব সিদ্ধি লাভ করেছে তবু অতৃপ্ত, কারণ জীবন মেটাতে পারে নি তাদের দাবি। যারা অজানার পিয়াসী, পূর্ণতার অভিলাষী, যাদের আকুল প্রশ্ন সবের নিশ্চিত উত্তর মেলেনি তারাই পূর্ণযোগের জন্য প্রস্তুত।

প্রচলিত নিয়ম-নীতিতে বীতশ্রদ্ধ এবং মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে উৎসুক তাদের সম্মুখে অনিবার্য ওঠে কতকগুলি প্রশ্ন। প্রশ্নগুলি বলা যায় এই রকম :

তুই যদি শেষ নিয়তি তবে জন্ম হয় কেন?
দুঃখভোগই যদি একমাত্র সত্য তবে জীবনধারণ কেন?
বিচ্ছেদই যদি অনিবার্য তবে ভালোবাসা কেন?
চিন্তা করা যদি ভুলের কবলে পড়া, তাহলে আদৌ চিন্তা করা কেন?
কর্ম অর্থই যদি ভ্রমে পতিত হওয়া তবে কর্ম করা কেন?

ন্যায়সঙ্গত উত্তর চাই, না হওয়া উচিত তা হয় নি, এই বিরোধগুলিও অনিবার্য নয়, তাদের মীমাংসা সম্ভব এবং একদিন তারা মিলিয়ে যেতে বাধ্য। বিশ্ব এই রকমই চিরদিন থাকবে না। পৃথিবী চলেছে একটা পরিবর্তনের অবস্থার মধ্যে দিয়ে : ক্ষণস্থায়ী মানুষী চেতনার কাছে সে-সময় মনে হয় দীর্ঘ, কিন্তু শাশ্বত চেতনার কাছে তা-ই আবার বিপুলতর। অতিমানস চেতনার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কাল পূর্ণ হবে। বিরোধের স্থানে তখন আসবে সামঞ্জস্য, বৈপরিত্যের স্থানে সমন্বয়।

এই নবসৃষ্টি, এই অতিমানস জাতির আবির্ভাব নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা তর্ক-বিতর্ক চলছে। ভাবী অতিমানসের রূপ নিয়ে অল্প-বিস্তর আত্মতুষ্টিকর কল্পনা মানুষকে খুশীই করে। কিন্তু রসজ্ঞ ব্যক্তিই রসের মর্ম জানে। একমাত্র দিব্য প্রকৃতির খাঁটি চেতনা লাভ করলেই আমরা বুঝতে পারব দিব্য প্রকৃতির প্রকটরূপ কী হবে। তবে যারা এই চেতনা লাভ করেছে তারা তাকে ভাষায় বর্ণনা করার চেয়ে অতিমানুষ হয়ে উঠতেই বেশি ব্যগ্র।

তা যাই হোক, অতিমানুষ যে কি হবে না সে কথা বরং বললে অনেক ভুল ধারণার অবসান হবে। আমি এক জায়গায় পড়েছি অতিমানুষ হবে নির্দয় এবং নির্মম ; নিজেরা দুঃখ-যন্ত্রণার অতীত হলে অন্যের দুঃখ-যন্ত্রণাকে তারা দেখবে নিকৃষ্টতা এবং দুর্বলতার চিহ্ন হিসাবে। [illegible] যারা এভাবে দেখে তারা মানুষ আর অতিমানুষের সঙ্গে তুলনা

করে মানুষ তার চেয়ে নিকৃষ্টতর জীবের সঙ্গে যে ব্যবহার করে তার উপমা ধরে। কিন্তু এরকম ব্যবহার উৎকৃষ্টতার চিহ্ন তো নয়ই বরং অচেতনা এবং মূঢ়তার লক্ষণ। এর প্রমাণ, মানুষ যত উপরে ওঠে তত সে নীচের জীবদের প্রতি দয়াপরবশ হয়, তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে। তবু, অতিমানুষের কঠোর হওয়া কথার মধ্যে একটুখানি সত্য আছে: তা হল এই যে এরকম উন্নততর জীবের থাকবে না অহংপূর্ণ দুর্বল ভাবানুভাবময় দয়া—যাকে মানুষ বলে পরহিতব্রত। এই দয়া উপকারের চেয়ে অপকারই করে বেশি এর পরিবর্তে আসবে এক জ্ঞানদীপ্ত এবং শক্তিমান করুণা যার একান্ত লক্ষ্য হবে দুঃখের আমূল উৎপাটন, তাকে চিরস্থায়ী করা নয়।

অধিকন্তু, ধারণাটির মধ্যে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে সেই এক চিত্র—প্রাণশক্তির বিভূতি যারা তাদের অধীনে পৃথিবীর অবস্থা কি হবে তাই। স্বভাবত তারা অক্ষর, মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাপন্ন, সেই সঙ্গে একান্তই ভগবান-বিরোধী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাদের ব্রত হল ততদিন পর্যন্ত ভাগবত সিদ্ধিটি বিলম্বিত করা যতদিন সে সিদ্ধির আধার—মানুষ—না হয়ে উঠেছে শুদ্ধ, সমর্থ, সিদ্ধ, সকল বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম। এই অমঙ্গলের রাজত্বকে দুঃখভারে জর্জর পৃথিবীকে আগে হতেই সতর্ক করে দেওয়া হয়ত নিরর্থক নয়।

অতিমানুষ স্বয়ং এসে মানুষের কাছে প্রমাণ করবে তার আসল প্রকৃতি, ইতিমধ্যে যাদের সদিচ্ছা আছে তাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে নিজের মধ্যে সুন্দরতম মহত্তম সত্যতম হতে পারে যা তার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, যার আস্পৃহা রাখা যে এই চেতনা তার মধ্যে সিদ্ধি লাভ করুক পৃথিবী এবং সকল মানুষের বৃহত্তম কল্যাণের উদ্দেশ্যে।

* Bulletin of Physical Education Vol. VI No. 3 থেকে অনুবাদ।

নববর্ষের পূর্বমুহূর্তে

শ্রীমায়ের বাণী

আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, আগামী বছরটি হবে বড়ই দুর্যোগপূর্ণ। প্রচুর অস্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রচুর বাহ্য সংঘর্ষও ঘটবে। তাই সেই সব অবস্থায় তোমাদের কি ভাবে চলা উচিত, সেই কথাই আজ তোমাদের বলব। বাধাবিঘ্নগুলি গোটা বছর ধরে চলবে, এমন কি হয়ত আরও কিছু দিন, চোদ্দমাস থাকতে পারে। কিন্তু যা কিছুই ঘটুক, আমি আশা করি, যে-মনোভাবটির কথা আমি তোমাদের বলছি, তা কোনদিন তোমরা হারাবে না।

বস্তুত, বাধাবিঘ্ন যত বেশী হয়, তত বেশী তোমাদের শান্ত থাকা চাই, এবং তত বেশী করে তোমাদের বিশ্বাসটিকে অবিকম্পিত রাখা চাই, একথা আমি বিশেষ জোর দিয়ে বলছি তোমাদের। কারণ আর সব কিছুর চাইতে এইটি সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হলে সাধারণত লোকেরা চঞ্চল হয়ে পড়ে, তাদের উত্তেজনা বেড়ে যায়, তারা আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে। ফলে বাধাবিঘ্নগুলি আরও শতগুণে বেড়ে যায়। তাই তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, যেন তোমরা অমনটা কোর না। তোমরা ওর ঠিক বিপরীত আচরণ করবে। আজ এইমাত্র তোমাদের আমি নতুন বছরের যে বাণীটি দিলাম, সেটি বারবার আবৃত্তি করবে। যে-মুহূর্তে উদ্বেগের কোন কারণ ঘটবে, তৎক্ষণাৎ, যে কথা আজ তোমাদের বলছি তা স্মরণ করবে, এবং সারা বছর ধরে সেগুলি মনে রাখবে। সকালে ও সন্ধ্যায় এ বাণীটি তোমরা আবৃত্তি করতে পার, তার দ্বারা উপকৃত হবে।

*

প্রশ্ন : বর্তমানে মানুষী-ইচ্ছার মধ্যে বিশেষ করে কোনটি ভগবৎ-বিরোধী?

শ্রীমা সকল মানুষী-ইচ্ছাই যা ভগবৎ-ইচ্ছার উল্টো কাজ করে, তাই হল ভগবৎ-বিরোধী, যেখানেই তা আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, এমন কি তোমার নিজের মধ্যেও। দিব্য-ইচ্ছার মধ্যে কোন রাজনীতিক দল নেই, সেখানে আছে শুধু চেতনার সুষ্ঠু বিন্যাস।

প্রশ্ন : মা, তুমি ১৪ মাসের উল্লেখ করলে কেন, ১২ মাস নয় কেন?

শ্রীমা এ কথা তুমি হয়ত গ্রহ নক্ষত্রদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার। কিন্তু ব্যাপারটা ওই রকমই। তোমার নিজের কথাই ধর, তোমাকে বেশ বড় হয়ে পড়ে উঠতে এত বছর লাগে কেন? সব কিছুর বেলাতেই ওই কথা। সংঘর্ষটি কি রকমের, তারই উপর নির্ভর

করবে, কতকাল সেটি টিঁকবে। শক্তিগুলোকে তাদের বিকাশের একটা বিশেষ অবস্থায় পৌঁছতে হবে, যাতে করে তাদের একটা বিশেষ ফল ফলতে পারে, এবং সেই জন্যেই হয়ত অতগুলি বছরের প্রয়োজন।

আমরা সময়ের পরিমাপ করি আমাদের অল্পপরিসর ক্ষুদ্র জীবনের অনুপাতে। কিন্তু স্বভাবতই দিব্যশক্তিদের সময়ের পরিমাপ আমাদের মতন নয়, এবং তাঁদেরটি আমাদের কাছে যেন সুদীর্ঘ এবং অনিশ্চিত বলে ঠেকবে। কিন্তু ভগবৎ চেতনার কাছে, যেসকল পৌঁছতে হবে বলে ঠিক করা হয়েছে, সেই অনুপাতে ওইটিই সবচেয়ে হ্রস্ব, অন্য সব কিছু যুক্তি বিচার সত্ত্বেও। লক্ষ্যটি হল ভগবৎ-ইচ্ছার সার্থক অভিব্যক্তি, সে ইচ্ছা যাই হোক না কেন। অবস্থার যোগাযোগ ঠিক ঠিক ঘটলে ভগবৎ-শক্তি চিরদিনই সবচেয়ে হ্রস্ব পন্থাটি নির্বাচন করেন। যদিচ আমাদের ধারণা অনুযায়ী হয়ত সেইটিকেই দীর্ঘতম, জটিল এবং অনিশ্চিত বলে ঠেকতে পারে। তার কারণ আমরা সমগ্রটিকে দেখি না, আমরা দেখি একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, যেটি আমাদেরই পরিমাপের অনুপাত। আমাদের দৃষ্টি হল সংকীর্ণ, অর্থাৎ বস্তুর পিছনে যা আছে, সেই অনুপাতে আমাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ এবং বস্তুর সামনে যা আগে যা আছে সে অনুপাতেও আমাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ।

মানুষের দৃষ্টি হল সীমাবদ্ধ। তার বাঁধা গণ্ডীর বাইরে সে বিশেষ কিছুই দেখতে পায় না। অবশ্য এটা সত্যি যে মানুষ আগে থেকে নানা ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা করে, এবং তার জীবনটাকে সুশৃঙ্খলিতভাবে গড়তে চেষ্টা করে, কিন্তু আগে থেকে, মাত্র কয়েক বছর আগে থেকে, কজন বলতে পারে, তাদের জীবনে কি ঘটবে না ঘটবে? মানুষের দৃষ্টি চলে সোজা লাইন ধরে, অর্থাৎ তার সামনে সব কিছুই এসে উপস্থিত হয় একের পর আর, এই পর্যায়ে, সার বেঁধে। কিন্তু দিব্য-দৃষ্টি হল ভিন্ন বস্তু। তা হল সমগ্র এবং তা বিশ্বব্যাপী। কোন কিছুকে তা দেখে সমগ্রভাবে, অর্থাৎ সবদিক দিয়ে খুঁটিয়ে, কোন একটি দিক বা একটি অংশের উপর সে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে না। উর্ধ্বতম সে দৃষ্টি, এবং পলকেই তা যে কোন বিষয়ের সকল দিক এবং সব সম্ভাবনা সম্পূর্ণ দেখে নেয়। শুধু উপর উপর দেখেই ছেড়ে দেয় না, গভীর তলদেশ পর্যন্ত সে দৃষ্টি চলে। কোন প্রশ্নের সমস্ত কিছু দিককে সে আমল দেয়, এবং সমাধানের ব্যাপারে কোনটিকেই বাদ দেয় না, বা উপেক্ষা করে না। মানুষ কিন্তু করে ঠিক এর উল্টোটা। সে সোজা লাইন ধরে চলে, এবং যেটাই তার এই সোজা লাইনের উপর না পড়ে সেটাকে সে দেখতেই পায় না, এবং তার নিজের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে অন্য এই সব জিনিসগুলি কোনদিনই সমাধানের সুযোগ পাবে না। ভগবৎ-শক্তির পথ নেয় বৃত্তের আকার, অথচ সেইটিই হল সব চেয়ে সোজা পথ।

*

প্রশ্ন বাধাবিঘ্নগুলি হবে ব্যক্তিগত না সমষ্টিগত?

শ্রীমা হবে সকলের জন্যেই। পৃথিবী, ভারতবর্ষ, আশ্রম এবং ব্যক্তিগতভাবে সকলেরই জন্যে। কম বেশী সমভাবে সবাইকেই তা ভোগ করতে হবে। বলতে পারি যে, বিরোধী শক্তিদের এই হল শেষ চেষ্টা, তাদের শেষ আশা। বর্তমানের দিব্য-উপলব্ধিকে নষ্ট করে দিয়ে, তার উপর বিজয় লাভের এই হল তাদের শেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু আমাদের হাল ছাড়লে চলবে না, খুব শক্ত করে ধরে থাকতে হবে, এবং আমরা যদি এই বিপদ অতিক্রম করতে পারি, তাহলে পরে দেখব যে অবস্থা বেশ সহজ হয়ে যাচ্ছে। বাধাগুলো তখন ক্রমশ শিথিল হতে হতে একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

বিরোধীশক্তিগুলো চিরকালই চেষ্টা করে আসছে, দিব্য-উপলব্ধিকে যতদূর সম্ভব পিছিয়ে দিতে, এবং জগতের উপর তাদের অধিকার যত দীর্ঘকাল সম্ভব বজায় রাখতে। সেই সংঘর্ষ বোধ হচ্ছে এখন যেন তার চরমে এসে পৌঁছেছে। এই হল তাদের শেষ চেষ্টা। এই শক্তিগুলো মোটেই অন্ধ বা অজ্ঞান নয়, তাদের পিছনে সচেতন সব সত্তা বিরাজ করছে, এবং তারা খুব ভাল করেই জানে যে, এই হল তাদের শেষ চেষ্টা। তাই তারা তাদের যত শক্তি, যত সামর্থ্য আছে, সমস্ত একযোগে প্রয়োগ করছে এই জীবনমরণের সংগ্রামে, আর তাদের করবার ক্ষমতাও প্রচণ্ড। তারা মোটেই মানুষদের মতন ক্ষুদ্রশক্তি, ক্ষুদ্রচেতনার জীব নয়। মানুষের তুলনায় তারা দুর্দান্ত শক্তিমান। এমন কি স্বয়ং ভগবান বলেই ভুল হয়, এতই বিশাল তাদের ক্ষমতা, এবং তাদের জ্ঞান পর্যন্ত এতই বেশী। পৃথিবীতে তারা সাংঘাতিক যুদ্ধে নিযুক্ত। কারণ এই পৃথিবীর মাটির উপরেই লাভ করতে হবে চরম বিজয়। এবং এই বিজয়েরই দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে যাবে, ভবিষ্যতে পৃথিবীর গতি হবে কোন পথে।

অবস্থা যখন হয় বিশেষভাবে সংকটাপন্ন, তখন যাদের অন্তরাত্মা যাপনা থেকেই ঊর্ধ্বের দিকে ঠেলে ওঠে, এবং যাদের বহির্ভাগ তখন সকল উদ্বেগশূন্য হয়ে শান্ত ঊর্ধ্বমুখী থাকে, তারা খুশি হবে এমন অবস্থা পেলে।

এই হল সময়, নিজেকে জয় করবার, নিজেকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার।*

---

* শ্রীমায়ের কথাগুলি ফরাসীতে থেকে ইংরেজীতে সার-সংকলন করেন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। এটি তারই বাংলা। ইংরেজীটি Mother India January 1955 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

(নববর্ষের বাণী পাঠের পরে যা পড়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের রচনা থেকে এই দু'টি কবিতাংশ)

ONE DAY

THE LITTLE MORE

One day, and all the half-dead is done,
One day, and all the unborn begun;
A little path and the great goal,
A touch that brings the divine whole.

Hill after hill was climbed and now,
Behold, the last tremendous brow
And the great rock that none has trod:
A step, and all is sky and God.

(*Poems Past and Present, p. 17.*)

*

Even in rags I am a god;
Fallen, I am divine;
High I triumph when down-trod,
Long I live when slain.

(*Ibid. Stanza 7 of "Life."*)

আর মাত্র একদিন, এখনি বিলুপ্ত হবে অর্ধমৃত যত ;
শুধু এক দিবসান্ত, এখনি লভিবে জন্ম যা'রা অনাগত।
সরণী সঙ্কীর্ণ আর মুহূর্তে মহান লক্ষ্যে সঙ্গম সম্ভবে,
শুধু এক স্পর্শমাত্রে দেবাসীন-অসীনতা সম্মিলিত হবে।

প্রগতি উত্তীর্ণ হ'ল শৈল হ'তে শৈলান্তের শিখরান্তরাল,
এখন সম্মুখে শুধু অবশেষ-পর্বতের ভয়ঙ্কর ভাল,
ঊর্ধ্বে তার মহা অদ্রি : শৃঙ্গে যার নাই কভু কা'রো অভিযান,
শুধু এক পদক্ষেপে বিশ্ব হবে ঊর্ধ্বলোক আর ভগবান।

*

অঙ্গে আমার জীর্ণবসন, তবু আমি ভগবান ;
পতিত হলেও, আমি বিশুদ্ধ, বিশ্বপাবন আমি ;
ভূতলে দলিত, তবু আনন্দে হই সমূর্ধ্বগামী ;
নিহত হলেও, শাশ্বত মোর জীবনের অভিযান।*

* কবি নিশিকান্ত কর্তৃক অনূদিত।

অকপটতা*

শ্রীমা

প্রশ্ন অকপটতা বলতে ঠিক কি বুঝায়?

উত্তর: অকপটতার আছে নানা পর্যায়। একেবারে সব চেয়ে গোড়ারটি যদি ধর, তা হল, "পেটে এক মুখে আর" না করা, অর্থাৎ তুমি মুখফুটে বললে একটা কথা, অথচ মনে মনে রয়েছে অন্য আর একটি, ভাণ করে কিছু একটির বিষয় উল্লেখ করলে কিন্তু মনের মধ্যে আছে অন্য কিছু, এমনটা না করা। একটা উদাহরণ নাও, প্রায়ই যেটা ঘটে থাকে, তুমি বললে, "আমি চাই উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে, আমার দোষত্রুটি সংশোধন করতে, তাদের হাত থেকে মুক্ত হতে," অথচ সেই একই সঙ্গে, অন্যদিকে তুমি তোমার দোষগুলিকে দিব্যি পোষণ করে রাখলে তোমার চেতনাতে। আর শুধু তাই নয়, তোমার সব অভ্যাসগুলিকে খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখলে, যাতে অন্য কেউ সেগুলিকে না দেখতে পায়। কারণ কেউ সেগুলি দেখতে পেলেই হয়ত তোমাকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করবে, তোমাকে সেগুলি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। এ ব্যাপারটি খুবই সাধারণ, প্রায় নিত্য ঘটে। এটি দ্বিতীয় পর্যায়ে চলে গেল।

প্রথম পর্যায়টি কেমন জান, যেমন একজন দেখাচ্ছে যে, তার অধ্যাত্মজীবন লাভের আগ্রহ খুবই, সে একান্তই তা চায়, এবং পরমুহূর্তেই এমন সব কাজ করছে, যেগুলি অধ্যাত্মজীবনের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং সে সব করতে সে এতটুকুও লজ্জা বা সংকোচ বোধ করছে না। এ হল অকপটতার, বরং বলা উচিত কপটতার বিচিত্র নিদর্শন।

কিন্তু এর দ্বিতীয় পর্যায়ও আছে, যে বিষয়ে তোমাদের এইমাত্র বললাম। সেটি এই রকম, সত্তার একটি অংশ আছে যার মধ্যে অভীপ্সা রয়েছে জাগ্রত, এবং সে বলে, এমন কি চিন্তা করে, অনুভব করে পর্যন্ত যে, সে যথার্থই চায়, তার যত দোষ ত্রুটির, যত অপূর্ণতার হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে। কিন্তু সেই একই সময়ে তার সত্তার অন্য অংশগুলো সযত্নে সেই সব দোষ ত্রুটি এবং অপূর্ণতাগুলোকে লুকিয়ে রাখে, যাতে সেগুলোকে পর্দার বাইরে না আনতে হয়, এবং সংশোধন করতে না হয়। এটি প্রায় অনুক্ষণই ঘটছে।

এখন যদি আরও অনেকটা এগিয়ে যাও, এবং অকপটতার এই ব্যাখ্যাটিকে পরিষ্কার করে সামনে ধর, ত দেখতে পাবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সত্তার মাঝে এমন একটিও কোন

* শিক্ষাসঙ্ঘে কথিত। মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ।

অংশ অবশিষ্ট থাকবে, যে তোমার ভগবৎমুখী কেন্দ্রীয় অভীপ্সার বিরুদ্ধাচরণ করে, ততক্ষণ তুমি ষোল আনা খাঁটি নও। তার মানেই হল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত খাঁটি হওয়া অতিশয় দুরূহ, কদাচিৎ এমনটি মেলে।

যেটা খুবই চলতি, নিত্য যা ঘটে, তা হচ্ছে যে, মানুষ তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই যখন এমন সব জিনিষ দেখতে পায়, যেগুলো সে নিজেই পছন্দ করে না, তখন সেগুলোকে সে নিজের কাছ থেকেই লুকিয়ে রাখবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, বেশ সুবিধাজনক কৈফিয়ৎ খুঁজে বের করে, অথবা সেই জায়গাটা চুপি চুপি বেশ নাড়াতে থাকে (এই বলে, শ্রীমা ব্যাপারটি পরিষ্কার করবার জন্যে নিজের বাঁ হাতের চেটোর উপর ডান হাতের তর্জনীটি খুব তাড়াতাড়ি ক্ষুদ্র বৃত্তাকারে ঘোরাতে লাগলেন)। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, ওভাবে কোন জিনিস যদি অস্থির হয়ে কাঁপে, তাহলে সেটাকে পরিষ্কার ঠাহর করা যায় না। ঠিক সেই ভাবেই, মানুষের যে জায়গাটায় কোন দোষ রয়েছে, সেখানটায় ওই রকমের এক কম্পনের তরঙ্গ হতে থাকে, আর তার দরুণ তোমার চোখে ধাঁধা লাগে, তুমি আর তোমার দোষ ত্রুটি দেখতে পাও না। আর এমনটি ঘটে আপনা আপনিই, তোমাকে ভেবে চিন্তে করতে হয়না, প্রকৃতিতে ও-খেলা তোমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ হয়েই ঘটে বসে। অথচ এ সবই হল কপটতা, মিথ্যাচার।

মানুষ সম্পূর্ণ অকপট, সম্পূর্ণ খাঁটি কখন হয় জান, যখন দিব্য-সান্নিধ্যের, দিব্য-ইচ্ছার চেতনাটি তার সত্তার কেন্দ্রস্থলে হয় সুপ্রতিষ্ঠিত, যখন সমগ্র সত্তাটি অখণ্ডভাবে হয়ে ওঠে আলোকে উদ্ভাসিত, স্বচ্ছ, সুনির্মল, এবং সে জীবনের প্রতিটি ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে ওই চেতনাকেই অভিব্যক্ত করে, তখনই তাকে বলে সত্যিকারের খাঁটি হওয়া।

যখন, যে কোন মুহূর্তে, যা কিছুই ঘটুক, তুমি নিজেকে দিব্যশক্তির হাতে সমর্পণ করেছ, এবং দিব্য ইচ্ছার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই চাও না ; যখন, যে কোন মুহূর্তে, যে অবস্থাতেই তুমি থাক না কেন, অনুক্ষণ তোমার সত্তার সকল অংশ সমস্বরে ভগবানকে বলতে পারে, "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক", এবং এ বলা যখন হবে স্বতঃস্ফূর্ত, অখণ্ড, সম্পূর্ণ, তখনই তুমি হয়েছ খাঁটি। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এই অবস্থাটিতে তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত না হচ্ছ, ততদিন তোমার অকপটতা বিশুদ্ধ নয়, তা কম বেশী মিশ্র।

ঈশোপনিষদ

শ্রীঅরবিন্দ

(অনুবাদ, পূর্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ প্রবাহ

সূর্য ও অগ্নি

(শ্লোক, ১৫-১৮)

পরলোক

তৃতীয় শ্লোকে অন্ধতমসাবৃত সূর্যহীন লোকের উল্লেখ রয়েছে। বিচারের তৃতীয় প্রবাহেও আত্মার অন্ধতামসে প্রবেশের কথা দুবার বলা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় যেন এখানে উদ্দিষ্ট হল চেতনার অবস্থা, লোক নয়। তবে, বস্তুতঃ এ দুই উক্তিতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, কারণ বেদান্তমতে লোক তো সচেতন সত্তার অভিব্যক্ত অস্তিত্বের উপাদানভূত সপ্ততত্ত্বের দ্বারা গঠিত একটা সুবিন্যস্ত সংস্থিতি বই নয়। এখানে, পৃথিবীতে দেহধারণ করে' আমরা চেতনার যে অবস্থাতে উপনীত হই, আমাদের মনোময় সত্তা দেহ থেকে প্রয়াণ করবার পরেও আমাদের চৈতন্যের অবস্থা এবং তার দ্বারা ব্যবস্থিত পরিবেশ তারই অনুযায়ী হবে। কারণ, বিশ্লেষী ব্যষ্টি আত্মার পক্ষে মাত্র তিন প্রকার গতি সম্ভব হয় তাকে অস্তিত্বের সাধারণ সব উপাদানের মধ্যে মিশে যেতে হবে, নাহয় ব্রহ্মে বিলীন হতে হবে আর না হয় পার্থিব ছাড়া চেতনার অপর কোন সংস্থিতিতে এবং দেহাশ্রিত জীবনের জন্য বিহিত সব সম্বন্ধ ব্যতীত, বিশ্বের সঙ্গে অন্যবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করে' বর্তমান থাকতে হবে। চেতনার এই সব অবস্থা এবং তার উপযুক্ত সব সম্বন্ধই হল অপর লোক বা মৃত্যুর পরের লোক।

অবস্থাত্রয়

অভিব্যক্ত বিশ্বসম্পর্কে আত্মার তিন অবস্থার কথা এ উপনিষদে পাওয়া যায় : দেহে জন্মগ্রহণের ফলে পার্থিব অবস্থা, মৃত্যুর পরে অন্যান্য অবস্থাতে ব্যষ্টি আত্মার উদ্বর্তন এবং অবর্ণ অস্তিত্ব, যা জন্মমৃত্যুর অতীত এবং অভিব্যক্তির অতীত হলেও, অন্তর্নিবাসীরূপে সব আধারে প্রবেশ করতে পারে এবং প্রভুরূপে প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে পারে। প্রথম

দুই অবস্থা সম্ভূতির অধিকারে, অনন্তর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অসম্ভূতিতে, পরমাত্মাতে—সম্ভূতির তিনিই ভোক্তা।

•পার্থিব দেহে পুনর্জন্মের কথা এ উপনিষদে পরিষ্কার করে বলা না হলেও, তার ভাব ও ভাষাতে সে বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়, বিশেষ করে ১৭শ শ্লোকে। পুনর্জন্মে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে', মৃত্যুর পরে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন তিনটি উদ্দেশ্যের উপর দৃষ্টি রাখতে পারে : পৃথিবীতে উৎকৃষ্টতর ও সুভগতর এক বা বহুজীবন, পৃথিবীর ঊর্ধ্বে জ্যোতি ও সুখের লোকে হর্ষোল্লাসে নিত্যরতি অথবা সর্বাতিশায়িত্ব, অর্থাৎ সব বিশ্ব-অস্তিত্ব বর্জন করে', অনন্তচেতনার বাস্তবে সিদ্ধ বা সম্ভাব্য কোন আধেয়ের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না রেখে, নিজের সত্তা সত্তার মধ্যে যেমন, তেমনি পরাৎপরে মিশে যাওয়া।

পুনর্জন্ম

এ উপনিষদের শিক্ষাতে পৃথিবীতে সুভগতর এক বা বহু জীবনকে মানবাত্মার চরম পরিণতি বলে ধরা হয়নি। কিন্তু মুক্তি অর্জনের পূর্বে, জীব যতদিন নিজের পুষ্টি ও ব্যাপ্তি সাধনে নিরত থাকে ততদিন উপস্থিত উদ্দেশ্যরূপে তার একটা আবশ্যকতা থাকে। জন্মমৃত্যুর অধীনতা থেকে বোঝা যায় যে, মনোময় পুরুষ এখনও তার প্রকৃত অতিমানস ও অধ্যাত্ম সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয় নাই, কিন্তু "অবিদ্যার মধ্যে, অবিদ্যার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে" বাস করছে।* সে নিলনলাভের বিধিনির্দিষ্ট উপায় হল পৃথিবীতে মানব জীবন। মুক্তির পরে জীবাত্মা স্বাধীন, কিন্তু তখনও ইচ্ছামত সে সমগ্র জগৎ-গতিতে যোগদান করতে পারে এবং জন্মে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, তবে তার নিজের প্রয়োজনে আর নয়, পরিবারের জন্য এবং তার সব প্রবৃত্তির প্রভু অন্তর্যামী দিব্যসত্তার ইচ্ছাতে।

স্বর্গনরক

ওপারে, স্বর্গে পরম সুখ-ভোগও চরম সার্থকতা নয়। তবে, বেদান্তের শিক্ষাতে পুনর্জন্মের অর্থ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নূতন দেহে জন্মগ্রহণ নয়—মানবের মনোময় সত্তা শারীর ও জৈব সত্তার সঙ্গে এমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ নয়। সাধারণতঃ শারীর ও জৈব সত্তা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একসঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং, আবার পার্থিব জীবনে আসবার পূর্বে মানবাত্মার একটা অবকাশ চাই, যাতে সে পার্থিব সব অভিজ্ঞতা নিজের অঙ্গীভূত করে' নিয়ে, পৃথিবীতে নূতন শারীর ও জৈব সত্তা গঠন করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এই সময়ে তাকে ওপারে কোন না কোন সুস্থিতিতে বা লোকে বাস করতে হয়, এবং সেখানে তার যে বা অবস্থা তার ভবিষ্যৎ পরিণতির অনুকূলও হতে পারে, প্রতিকূলও হতে পারে। পরমাত্মতত্ত্বের

* অবিদ্যায়াং অন্তরে বর্তমানঃ—ঈশ, ১১।৯ : মুণ্ডক, ১।২।৮

আলোক (সূর্য যার প্রতীক) সে-সবের মধ্যে যতটা প্রবেশ করেছে সেই পরিমাণে সে-সব লোক প্রগতির অনুকূল হয়, কিন্তু অন্তর্বর্তী অজ্ঞান অন্ধকারের সব অবস্থা আত্মার প্রগতির পক্ষে হানিকর। তৃতীয় শ্লোকে যেমন বলা হয়েছে, সে-সব লোকে প্রবেশ করে যারা আত্মঘাতী, যারা আলোকের পথ রোধ করে বা পরিণতির সাধারণ ধারা বিকৃত করে নিজেদের অনিষ্ট করে। বেদান্তের স্বর্গ হল এই সব আলোকের ও আত্মপ্রসারের অবস্থা, আর যে-সব নরক আত্মাকে পরিহার করতে হবে সে-সবের প্রকৃতি হল অন্ধকার, আত্ম-আবরণ, আত্মবিকৃতি।

সুতরাং, আত্মার ব্যক্তিগত পরিণতির দিক থেকে, পার্থিব জীবনের মতই, পারলৌকিক জীবন একটা উপায় মাত্র, স্বতন্ত্র কোন উদ্দেশ্য নয়। মুক্তির পর জীবাত্মা ভাগবত অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে যেমন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করতে পারে, তেমনি সে-সব লোকেও বিচরণ করতে পারে, কারণ সে-সব নিয়েই পূর্ণ অভিব্যক্তির ক্ষেত্র রচিত হয়, তার প্রত্যেকটিই অন্য সবার সঙ্গে গ্রথিত, অপর সবের আশ্রয় এবং সচেতন সত্তার সমগ্র সুবিন্যস্ত সংস্থিতির এক একটি অংশ।

উৎক্রান্তি

পরিণতির লক্ষ্য উৎক্রান্তি, কিন্তু তাতে যাকে অতিক্রম করা হল তাকে যে বর্জন করতেই হবে, তা নয়। জীবের পক্ষে, উৎক্রান্তিকে নিজের নির্বাণ অবধি টেনে নেবার প্রয়োজন নাই, তা উচিতও নয়। নির্বাণ হল অহংএর সব দীনার বিলোপ, অভিব্যক্তির সব সম্ভাবনার বিলোপ নয় কারণ দেহ ধারণ করেও তা লাভ করা যায়।

জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে জীবকে যেসব বাসনা ত্যাগ করতে হয় তার সর্বশেষ হল ঐকান্তিক মুক্তির বাসনা, সর্বশেষ মোহ যা নষ্ট করতে হয় সে হল যে চলনের দ্বারা সে বদ্ধ হয়।

সূর্য ও অগ্নি

লোকসমূহের এই ধারণাকে এবং আত্মার সব বিভিন্ন সংস্থিতির অন্যোন্যসম্বন্ধকে ভিত্তি করে' এ উপনিষদে পরম অনুভব ও দিব্যসুখে উপনীত হবার জন্য জ্ঞান ও কর্ম এই দুই পথের নির্দেশ আছে। আর তা দেওয়া হয়েছে সূর্য ও অগ্নির কাছে প্রার্থনার আকারে। তাঁরা বৈদিক দেবতা, সূর্য পরম সত্তা ও তার আলোকের প্রতীক আর অগ্নি, যে ভাগবত ইচ্ছাশক্তি মানবের কর্ম উর্ধ্বমুখী করে, পবিত্র করে, পূর্ণাঙ্গ করে তার প্রতীক।

লোকসমূহের বিন্যাসক্রম

সূর্যের আসন ও কার্য সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে, সপ্তলোক সম্বন্ধে ও সে-সব লোকে চেতনার কোন্ কোন্ তত্ত্ব প্রতিরূপিত হয় সে সম্বন্ধে বেদের ধারণার মধ্যে একটু গভীর ভাবে প্রবেশ করতে হবে।

সচেতন সত্তা মাত্রেই স্বরূপতঃ এক ও অবিভাজ্য কিন্তু অভিব্যক্তিতে তা পরিণত হয় একটা জটিল ছন্দে, একটা সুসঙ্গত স্বরগ্রামে, স্থিতির বা গতির মর্যাদা অনুযায়ী একটা ক্রমবিন্যাসে। কারণ, আমরা যাকে স্থিতি বলি সেও জটিল গতির একটা বিন্যাস। সে বিন্যাসক্রম গঠিত হয় দুটী গতির দ্বারা একটা অবরোহণ বা বিবর্তনের গতি আর একটা অধিরোহণ বা বিবর্তনের গতি, আর তার উর্ধ্বতম পদ হল অধ্যাত্মসত্তা আর নিম্নতম, জড়।

অধ্যাত্ম সত্তাই 'সৎ' বা শুদ্ধঅস্তিত্ব—আত্মচেতনাতে শুদ্ধ, আত্মানন্দে শুদ্ধ। সুতরাং, অধ্যাত্মসত্তাকে সব সচেতন পুরুষের ত্রিবৃৎ ভিত্তি বলা যেতে পারে। তিনটি পদ আছে কিন্তু সে তিনটি প্রকৃতপক্ষে এক। কারণ, শুদ্ধ অস্তিত্ব মাত্রেই স্বরূপতঃ শুদ্ধ আত্মচেতনা এবং শুদ্ধ আত্মচেতনা মাত্রেই স্বরূপতঃ শুদ্ধ আত্মানন্দ। তথাপি, আমাদের চেতনা এ তিনের মধ্যে ভাবনার ও বাক্যের দ্বারা প্রভেদ রচনা করতে পারে, এমন কি নিজের বিভক্ত ও সীমা-বদ্ধ গতিবৃত্তিতে নিজের কাছে তাদের আপাতবিপরীত বোধেরও সৃষ্টি করতে পারে।

সচেতন সত্তার স্বভাব সম্বন্ধে সমগ্র সম্বোধি থেকে জানা যায় যে, স্বরূপতঃ অবশ্যই তা এক, কিন্তু আত্ম-অভিজ্ঞতাতে অনন্ত জটিলতার ও বহুত্বের অব্যক্ত সামর্থ্য তার আছে। সেই পরম একের মধ্যে অব্যক্ত জটিলতার ও বহুত্বের বিকাশকেই আমাদের দিক থেকে আমরা বলি অভিব্যক্তি বা সৃষ্টি, জগৎ বা সম্ভূতি ('ভুবন,' 'ভাব')। তাছাড়া কোন বিশ্ব-অস্তিত্ব সম্ভবপর হত না।

এ অভিব্যক্তি সাধন করে সত্তার আত্মসংবিৎ। নিজের মধ্য থেকে আত্মসংবিতের সব অব্যক্ত জটিলতা প্রকটিত করবার ক্ষমতাকে বলা হয় 'তপস্', বল বা শক্তি ; এবং আত্ম-সচেতন ব'লে প্রকৃতিতে তা 'ক্রতু' বা সংকল্পের মত। কিন্তু সংকল্প বলতে আমরা বুঝি, উদ্দিষ্ট বিষয়ের বাহিরে অবস্থিত যাহা উপাদানের উপর ক্রিয়াশীল, তার ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র একটা কিছু ; কিন্তু এ তা নয়। এ সংকল্প পরম সত্তাতে অন্তর্নিহিত, সম্ভূতিতেও অন্তর্নিহিত ও জগৎ-গতি থেকে অভিন্ন ; এ আত্মসচেতন সংকল্প নিজের মধ্যে যা দেখে বা বোধ করে তাতেই পরিণত হয়, নিজের ক্রিয়ার শক্তিরূপে তার প্রকাশ হয় আর সে ক্রিয়ার পরিণাম রূপে তার স্বরূপ প্রকটিত হয়। এই সংকল্পের দ্বারা, 'তপস্' বা 'চিৎশক্তির' দ্বারা সব বিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে।

উচ্চতর লোক

আত্মসংবৃত সত্তার যে-সব বিন্যাস শুদ্ধ সৎ-এর একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেসব হল 'পরার্ধের', ঊর্ধ্বতন সৃষ্টির অঙ্গীভূত,—চিন্ময় সব লোক। তার তিনটি প্রধান সংগঠন আমাদের কল্পনায় আসে।

আত্মসংবিতের শক্তি বা 'তপস্' যখন 'সৎ' বা শুদ্ধ অস্তিত্বকে ভিত্তি করে' অধিষ্ঠিত হয়, তখন সৃষ্ট হয় 'সত্যলোক' বা সত্তা অস্তিত্বের জগৎ। সত্যলোকে আত্মা তার সব অভিব্যক্তির সঙ্গে স্বরূপে একত্বের গুণে অভিন্ন, সুতরাং আত্মসংবিতের শক্তিতেও অভিন্ন এবং আনন্দেও অভিন্ন।

চিৎ-এর ক্রিয়াশক্তিকে ভিত্তি করে' তপস্ যখন অধিষ্ঠিত হয়, তখন সৃষ্ট হয় 'তপোলোক' বা আত্মসংবিতের শক্তির জগৎ। তপোলোকে আত্মা তার সব অভিব্যক্তির সঙ্গে এই পরা-শক্তিতে অভিন্ন বলে সে সবের সমষ্টিগত আনন্দও অভিন্নরূপে উপভোগ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বরূপ একত্বের ভাজন হয়।

সত্তার কর্মপ্রবৃত্ত আনন্দকে ভিত্তি করে তপস্ যখন অধিষ্ঠিত হয়, তখন সৃষ্ট হয় 'জন-লোক', সৃষ্টিপর আনন্দের জগৎ। জনলোকে আত্মা সব অভিব্যক্তির সঙ্গে সত্তার আনন্দে অভিন্ন আর সেই আনন্দের মাধ্যমেই সচেতন শক্তিতে ও স্বরূপ সত্তাতেও অভিন্ন।

চেতনার এই সব সংস্থিতির কোনটিতেই একত্ব ও বহুত্ব এখনও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সব আছে সবের মধ্যে, প্রত্যেকে আছে সবার মধ্যে, সব আছে প্রত্যেকের মধ্যে,—সহজভাবে, সচেতন সত্তার প্রবৃত্তি বলেই, সে বোধের জন্য ধারণার কোন উদ্যম বা প্রতীতির কোন ক্লেশ আবশ্যক হয় না। সেখানে কোন রাত্রি নাই বা অন্ধকার নাই। আর প্রকৃত-পক্ষে আলোক দেবার জন্য সূর্যের কোন বিশিষ্ট ক্রিয়া নাই। কারণ, চেতনার সবটাই সেখানে স্বতঃ জ্যোতির্ময়, অপর কোন আলোকের প্রয়োজন সেখানে নাই। ঈশ্বর বা পরম-পুরুষের একত্বের মধ্যে সূর্যের পৃথক্ অস্তিত্ব অবস্থিত হয় আর সেই ভাস্বর একত্বই হল সূর্যের সর্বাপেক্ষা কল্যাণময় রূপ।

নিম্নতর সৃষ্টি

নিম্নতর সৃষ্টিতেও তিনটি তত্ত্ব আছে জড়, প্রাণ, মন। সৎ সেখানে দেশে ব্যাপ্তি-শীল পদার্থের বা জড়ের রূপে প্রতিভাত হয়; ইচ্ছাশক্তি প্রাণরূপে প্রতিভাত হয়—তবে প্রকৃতিতে প্রাণ সৃজনের বা অভিব্যক্তির শক্তি, আর তার সৃষ্ট সব বিগ্রহে নিবর্তিত ও ও আচ্ছন্ন হ'লেও স্বভাবতঃ তা আত্মসংহত ইচ্ছাশক্তি। বাসনা ও সংবেদনের মধ্যে সত্তার আনন্দ আত্মসচেতন হতে যে প্রয়াস করে তার দ্বারা প্রাণ নিবর্তনের আচ্ছাদন থেকে মুক্ত হয়; আর তার ফলে মনের আবির্ভাব হয়। অন্ততঃ, অধিরোহণ বা ক্রমবিবর্তনের ধারাতে আমরা অবস্থিত বলে' আমাদের সেই প্রতীতি জন্মে।

যেখানেই জড় আছে সেখানেই নিবর্তিত বা বিবর্তনশীল প্রাণ ও মন রয়েছে। তেমনি আবার, প্রাণ-মনের ক্রিয়ার ক্ষেত্ররূপে জড়ীয় কোন না কোন আকার থাকে। বিভাজনাত্মক অবিদ্যাতত্ত্বের অধীন বলে' এই তিন তত্ত্বকে ত্রৈক মনে না হয়ে ত্রিধাভিন্ন মনে হয়।

চেতনার যে সংস্থিতির অন্তর্ভুক্ত আমরা, তথায় সেখানে জড়কে ভিত্তি করে অধিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য আকার নিয়ে, দেশে বিস্তৃত পদার্থের বিভাজনের দ্বারা আমাদের চেতনা নিরূপিত হয়। এই হল 'ভূর্লোক', জড়বিশ্ব, সাকার সম্ভূতির জগৎ।

কিন্তু আমরা এমন জগতের কল্পনা করতে পারি যেখানে ভিত্তি হল কর্মপ্রবৃত্ত প্রাণশক্তি এবং তাতে প্রকাশমান সংবেদন, যেখানে স্থূল জড়ের বাধার দ্বারা ব্যাহত না হয়ে প্রাণশক্তি তার সব আকার নিরূপণ করতে পারে। চেতনার এ বিন্যাসের ক্ষেত্র হল 'ভুবর্লোক', জৈবতত্ত্বের ইচ্ছানত আকারে স্বচ্ছন্দসম্ভূতির সব জগৎ।

আবার, চেতনার সুবিন্যস্ত এমন একটা সংস্থিতিরও কল্পনা করতে পারি, যেখানে চেতনা জড়সংস্পর্শজাত সংবেদনের অধীনতা থেকে মুক্ত এবং জৈব অভিব্যক্তির ফলে যে-আধারে সে অধিষ্ঠিত হয়েছে তার দ্বারা নিরূপিত নয়, কিন্তু প্রভুভাবে নিজের সব আকার নিজেই নিরূপণ করতে পারে। এই সংগঠন হল 'স্বর্লোক' বা স্বাধীন বিশুদ্ধ এবং ভাস্বর মনোবৃত্তির জগৎ।

এই সব নিম্নতর লোকে চেতনা সাধারণতঃ বিচূর্ণ ও বিভক্ত থাকে। সূর্যের আলোক, সত্তা, অবচেতনের অন্ধকারে অবরুদ্ধ থাকে অথবা কয়েকটি মাত্র কেন্দ্রে প্রতিফলিত হয়ে প্রকাশিত হয় কিংবা সেই কেন্দ্র ক'টিতেই গৃহীত হয়ে প্রত্যেকটির নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে তার কিরণ ব্যবহৃত হয়।

মধ্যবর্তী লোক

এই দুই সৃষ্টির মাঝে, তাদের একত্র গ্রথিত করে আছে যে লোক বা চেতনার যে সংস্থিতি তার ভিত্তি হল বস্তুর অনন্ত সত্তা। সর্বব্যাপী আত্মা সেখানে আর প্রবল ব্যষ্টিভাবের দ্বারা গ্রস্ত নয়, সেখানে চেতনার ভিত্তি হল তারই বৃহৎ মনঃপ্রভু, সে জগৎ-গতির সব ব্যষ্টি-কেন্দ্র সেই ভূমাতেই বিন্যস্ত আর তার কোন ব্যষ্টিই সমষ্টির মনঃপ্রভাবোধ বা অপর সব কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মভাবোধ কখনই হারায় না। মহত্ত্ব আর প্রবল হয়ে বিভাজন সৃষ্টি করে না, বরং সে-জগতের গতির সব জটিলতার মধ্যেই স্বরূপ একত্ব এবং স্বীয় সমষ্টির মনঃপ্রভার প্রতি উন্মুখ থাকে। সুতরাং এ জগৎকে 'মহর্লোক' বা ভূমাচেতনার জগৎ বলা হয়।

মহর্লোকের তত্ত্ব হল বিজ্ঞান বা ভাবনা। কিন্তু এ বিজ্ঞান সংবোধি-জাত, বরং বলা যেতে পারে, সত্যবিজ্ঞান বা তদ্বুদ্ধ ভাবনা,* বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যয় নয়। প্রভেদ হল

---

* সংবোধি (এত্যাদেশ, অন্তঃপ্রেরণা, বোধিজাত অনুভব বা বিবেক) হল মনের অধো, মনের সব সীমা মেনে নিয়ে, মনের সব ভাগের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারই। সত্য বিজ্ঞান বা প্রকৃত অতিমানস হল মনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটা শক্তি, পরম সত্তার সাক্ষাৎ একত্ব থেকে যার যে অনুযায়ী তার সব কাজ হয়; এ তাঁরই অন্তঃপ্রকাশক আত্মসংবিতের সত্য, সে নিজেকে নিজেরই অন্তঃপ্রকাশক আলোকের জ্যোতিতে জানে, কোন প্রয়াসের, এমন কি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানদীপ্ত প্রয়াসেরও, তার কোন প্রয়োজন হয় না।

যে, বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যয় আকারপ্রবণ, সে আকার কোন একটা ধারণার রূপ নেয় এবং একবার সে রূপ নির্দিষ্ট হয়ে গেলে, অপর সব প্রত্যয় থেকে একান্তভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কিন্তু বিশুদ্ধ সম্বোধিজাত বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞ ভাবনা পরম সত্তা ও সম্ভূতি, উভয়ের মধ্যেই নিজেকে দেখে। যে অস্তিত্ব নিজের প্রতীকরূপে আকার সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে সে একাত্ম, সুতরাং আকারে প্রচ্ছন্ন সত্যের জ্ঞান তার সর্বদাই জাগ্রত আছে। সত্তার আত্মসংবিৎ এবং পরম অদ্বিতীয়ের শক্তি তার প্রকৃতিগত, তাঁর সমগ্রভাব সম্বন্ধে সর্বদাই সে সজ্ঞান, সুতরাং সমগ্র অস্তিত্ব থেকে আরম্ভ করে' তার সব আধেয় সাক্ষাৎ ভাবে সে প্রত্যক্ষ করে। সে-প্রত্যক্ষের প্রকৃতি হল 'দৃষ্টি' দেখা, ধারণা করা নয়। সে-দর্শন, যুগপৎ স্বরূপ ও প্রতি-রূপের দর্শন। এই সম্বোধি বা তত্ত্ববিজ্ঞানই হল বেদের সত্য, সূর্যের আত্মদর্শন ও সর্বদর্শন।

সত্য ধর্ম

এ সত্যের মুখ একটা উজ্জ্বল আবরণে, যেন স্বর্ণপাত্রের দ্বারা, আচ্ছাদিত অর্থাৎ আমাদের মানস-চেতনার দৃষ্টি থেকে নিগূঢ়। কারণ, মনোময় জীব আমরা, আমাদের সাধারণ মন দিয়ে দেখার উর্ধ্বতন রূপও মনেরই সব প্রতীতি ও প্রত্যয় দিয়ে গড়া। সে-সব অবশ্যই জ্ঞানের উপায়, পরম সত্যের বহ্নি, কিন্তু স্বভাবতই সৎস্বরূপের সত্য নয়, বাহ্যরূপের সত্য মাত্র; সেসবের সাহায্যে আমরা বস্তুর প্রতিভাসের জ্ঞান সুবিন্যস্ত করে' তার পশ্চাতের সত্য অনুমান করতে চেষ্টা করি। সৎস্বরূপের সত্যই প্রকৃত জ্ঞান, মাত্র বাহ্যরূপ বা প্রতিভাসের সত্য 'জ্ঞান' নয়।

প্রকৃত সত্যে আমরা উপনীত হতে পারি শুধু যদি সূর্য আমাদের মধ্যে কাজ করে' প্রতীতি-প্রত্যয়ের এই উজ্জ্বল রূপায়ন দূর করে' তার স্থলে আত্মদর্শন ও সর্বদর্শন প্রতিষ্ঠিত করেন।

সেজন্য আমাদের মধ্যে পরম সত্যের ধর্ম ও ক্রিয়া অভিব্যক্ত হওয়া প্রয়োজন। সব-বস্তু ঠিক যা, আমরা যা, তা দেখতে আমাদের শিখতে হবে। বর্তমানে আমাদের কাজের যা ধারা তাতে আত্মজ্ঞান ও সংকল্প বিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের অস্তিত্ব অপর সবার থেকে পৃথক্, এই মূল মিথ্যা নিয়ে আরম্ভ করে' আমরা সব পৃথক সত্তার পার্থক্যের মধ্যে অন্যোন্য-সম্বন্ধ জানতে চেষ্টা করি এবং সেই মিথ্যায় গড়া জ্ঞানের উপর নির্ভর করে' ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করি। পরম সত্যের ধর্ম আমাদের মধ্যে কাজ করলে আমরা দেখতাম যে, আমাদের সমগ্র অস্তিত্বে অপর সবাই অন্তর্ভুক্ত, আমাদের অস্তিত্বের সব রূপ সমগ্রের ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত, এবং সমগ্রের মধ্যে ও সমগ্রের ক্রিয়ার দ্বারাই-তার সব শক্তি কাজ করে। তাহলে

আমাদের আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়া, সত্যকে বিকৃত করে' মিথ্যারূপে প্রতিফলিত করাই যার প্রকৃতি, এমন একটা মধ্যবর্তী তত্ত্ব থেকে উদ্বিত না হয়ে, স্বাভাবিক ও সাক্ষাৎভাবে আমাদের আত্মসত্তা থেকে ও বস্তুর মূল সত্য থেকে উৎসারিত হত।

মানবের মধ্যে সূর্য্যের পূর্ণোদয়

তবে, যে পরম সত্য আমাদের মুক্ত করবে তার অঙ্কুর, অন্ততঃ তার বীজ, আমাদের সাধারণ ক্রিয়াতেও আছে। প্রত্যেক ক্রিয়া ও প্রত্যেক প্রতীতির পশ্চাতে একটা বোধি, একটা সত্য আছে যার যাহারূপ অনিবার্য বিকৃত হয়ে মিথ্যাতে পরিণত হলেও সারস্বরূপ অবিকৃত থাকে এবং যার কাজ হ'ল নিজের আলোক ও পরিসর বৃদ্ধি করে' অভিব্যক্তির সত্যের দিকে আমাদের পরিচালিত করা। এই সব বিভাজন ও ভেদদর্শনের ক্লেশের পশ্চাতে রয়েছে একত্বের একটা সনির্বন্ধ প্রয়োগ এবং ক্ষেত্রভেদে পৃথক ফলের জন্য অবিরাম তার বিকৃতি হলেও, অবিচল অধ্যবসায়ের সঙ্গে তা আমাদের জ্ঞানে, সত্তাতে ও সংকল্পে অবশ্যম্ভাবী সমগ্রতার দিকে নিয়ে যায়।

সূর্যই 'পূষন্', পুষ্টি ও বৃদ্ধিদাতা। তাঁরই কাজ, এই খণ্ডিত আত্মপ্রতীতি ও সংকল্প-প্রয়োগ প্রসারিত করে', সমগ্র জ্ঞান ও ইচ্ছাতে পরিণত করা। তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা, অন্যান্য সব জ্ঞানের স্থলে তাঁর অভেদদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করে' পরিণামে তিনিই আমাদের একত্বে উপনীত হবার ক্ষমতা দেন। তখন বোধিলব্ধ এই সমগ্র দর্শন, অর্থাৎ সর্বময়ের মধ্যে প্রত্যেককে ও প্রত্যেকের মধ্যে সর্বময়কে প্রত্যক্ষ করাই হয় আমাদের যথাযথ কর্মপ্রেরণার ঋ—সত্য-ধর্মের প্রবর্তক। কারণ, সূর্যই 'যম' বা নিয়ন্তা ও বিধাতা, তিনিই নির্দিষ্ট ধর্ম স্থাপন করেন। এইভাবে আমাদের মধ্যে আলোকদাতা সূর্যের ক্রিয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, সত্যবিজ্ঞানের সমগ্রতা সিদ্ধ হয়। তখন আমরা দেখতে পাই যে, সূর্যের সত্তাতে, অর্থাৎ যে-বিজ্ঞানের দ্বারা পর পর সব লোক সৃষ্ট হয় তাতে, যা কিছু আছে সে-সবই হল একমাত্র অস্তিত্ব ও সব সম্ভূতির একমাত্র অধীশ্বরের মধ্যে, অর্থাৎ পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দের মধ্যে, জগতের সম্ভূতি। সব সম্ভূতিরই জন্ম পরম সত্তা থেকে, কিন্তু তিনি নিজে সব সম্ভূতির উর্ধ্বে, তিনি সে সবের প্রভু, প্রজাপতি।

সূর্যের দর্শনলাভ হলে তার উদ্ভাসনে সত্যজ্ঞান গড়ে ওঠে। সে গঠনের ধারাতে দুইটি ক্রিয়ার অনুক্রমের উল্লেখ এ উপনিষদে আছে। প্রথমত সূর্যের সব রশ্মি সুবিন্যস্ত বা যথাক্রমে সঙ্কলিত হয়, অর্থাৎ বস্তু-স্বরূপের ও তার প্রতীকের জ্ঞান পৃথক পৃথক বোধির দ্বারা লাভ করে' সে-সবের সাহায্যে আমাদের প্রতীতি-প্রত্যয়ের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন সব সত্য আবিষ্কার করা হয় এবং প্রকৃত অন্যোন্য-সম্বন্ধ অনুযায়ী করে' সে-সব সাজিয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে বোধিলব্ধ সমগ্রজ্ঞানে উপনীত হয়ে, আমরা পরিশেষে তা অতিক্রম করে' একত্বলাভের উপযুক্ত

হতে পারি। সে-ই হল সূর্যালোক সমাগত বা সমুদিত করা। আমাদের মনোবৃত্তির গঠনের জন্যই এই দ্বিবিধ ক্রিয়া আবশ্যক হয়, কারণ প্রাণিক সত্তাবিজ্ঞানের মত, আমাদের মন সাক্ষাৎ-ভাবে সমগ্র থেকে আরম্ভ করে', অভ্যন্তর থেকে তার মধ্যে কি আছে তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। বিমূর্ত বা বস্তুবিবিক্ত একটা ভাবরূপে, অথবা সমাহার বা শূন্যরূপে সাতীত আমাদের মন একত্বের প্রায় কোন ধারণাই করতে পারে না। সুতরাং, মনকে তার স্বকীয় ক্রিয়াপদ্ধতি থেকে ঊর্ধ্বতরের দিকে ধীরে ধীরে চালিয়ে নিতে হয়। নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিন্যাসের কাজই তাকে করতে হয়, তবে ঊর্ধ্বতর বৃত্তির সাহায্যে ও তার ক্রিয়ার দ্বারা ; তাতে সে বিন্যাস আর মনের উচ্ছ্রানত হয় না, হয় অস্তিত্বের পরম সত্যের ক্রিয়ার দ্বারা অনুসরণ করে'। পরে, এইভাবে ধীরে ধীরে অভ্যন্ত ক্রিয়ার ধারা ক্রমাগত সংশোধন করে', সে ধারাকেই বিপরীত-মুখী করে' মন সমগ্র থেকে তার সব আহরে অগ্রসর হতে শিখতে পারবে ; এখনকার মত, অংশগুলিকে* পূর্ণবস্তু বলে' ভুল করে', সে সব থেকে তাকে আর আপাতদৃষ্টিতে সমগ্র অপর একটা বস্তুতে অগ্রসর হতে হবে না, যা ও আবার প্রকৃতপক্ষে অংশমাত্র এবং যাকে ভুল করে' একটা পূর্ণবস্তু বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

'একং সৎ'

এইভাবে সূর্যের উদ্ভাসনের ফলে, আমরা পরম অতিচেতনের যে আলোকে উপনীত হই তাতে এমন কি সমগ্রদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত বস্তুসত্যের সর্বোধিলব্ধ জ্ঞানও 'একং সৎ'-এর স্বয়ংপ্রভ আত্মদর্শনে পরিণত হয় ; আর সে পরম অদ্বিতীয়ের আত্ম-অনুভব কখনও স্বকীয় একত্ব বা আত্মজ্যোতি হারায় না এবং সে আত্ম-অনুভবের অনন্ত জটিলতার মধ্যেও তিনি নিত্য এক। এই হল সূর্যের দিব্যতর রূপ। কারণ, এই হল পরম জ্যোতি, পরম ইচ্ছাশক্তি, অস্তিত্বের পরম আনন্দ।

তিনিই ঈশ্বর, পরমপুরুষ, আত্মচেতন সত্তা। এ দৃষ্টি হ'লে সমগ্র আত্মজ্ঞান লাভ হয়, দর্শনের পরাকাষ্ঠা হয় ; আর এ উপনিষদে তারই বর্ণনা করা হয়েছে 'সোঽহং', এই মহাবাণীর দ্বারা। "ঐ, ঐ যে পুরুষ সেই আমি"। ঈশ্বর জগতের সব গতিতে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন, বহুরূপের মধ্যে বাস করেন, কিন্তু সবের মধ্যে যিনি বাস করেন তিনিই পরম এক। এই আত্মজ্ঞ সত্তাই সত্য আমি, যাকে ব্যষ্টি বিগ্রহে অধিষ্ঠিত মনোময় সত্তা নিজের প্রকৃত অহং বলে জানতে পারে, এ সে-ই। ইনিই সর্বময়, তথা সর্বময়েরও ওপারে, সর্বাতিগামী।

* প্রকৃত পক্ষে অংশ বলে' কিছুই নাই কারণ অখিল অবিভাজ্য।

কর্ম ও দিব্যক্রতু

কর্মের দিক

তাহলে মর্ত্যভাব থেকে অমরত্বে প্রগতির মূলসূত্র আমরা পাই সূর্যের সাহায্যে—যে আলোক নিয়ে মন পরিণামে নিজেকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় ক্রমশঃ তার বৃদ্ধি করে'। সূর্যদ্বার* দিয়েই ব্যষ্টিসত্তার সীমাবদ্ধ চেতনা সর্বাগ্রেসী এক পরমাত্মার ক্রোড়ে পূর্ণ চেতনাতে ও জীবনে উপনীত হয়।

চেতনা ও জীবন উভয়ই অমরত্বের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। কর্ম ছাড়া জ্ঞান অপূর্ণ থাকে। তপসের দ্বারা চিৎ, শক্তির দ্বারা সচ্চিৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এবং পুরাতন ঋষিদের কাছে সূর্য যেমন দিব্য জ্যোতির প্রতীক, অগ্নিও তেমনি বল, সাবর্ধ্য, চেতনার অন্তঃস্থিত ইচ্ছাশক্তির প্রতীক। অগ্নির কাছে প্রার্থনা করে' সূর্যের কাছে প্রার্থনা সম্পূর্ণ করা হল।

ব্যষ্টি সংকল্প

যেমন জ্ঞানে তেমনি কর্মে, একত্বই হল সবের আশ্রয়। বিভাজনকে স্বধর্ম বলে স্বীকার করে', ব্যষ্টি নিজেকে তার অহংভাবিত সীমার অববোধে বিচ্ছিন্ন করে' রাখে, তাই তার ক্রিয়া-বৃত্তি মৃত্যুর অধীন, তমসাচ্ছন্ন ও জ্ঞানহীন না হয়ে যায় না। তার কর্মের উদ্দেশ্য ও উপায় সে স্থির করে যে জ্ঞান অনুসরণ করে' তাও ব্যক্তিগত, এবং তা নিয়ন্ত্রিত হয় বাসনা, অভ্যস্ত চিন্তার ধারা ও অবচেতনের অন্ধ সব প্রেরণার দ্বারা অথবা বড়জোর একটা ভগ্ন, আংশিক ও চঞ্চল আলোকের দ্বারা। সে বাস করে দিনের ছায়ালোকে, সূর্যের পূর্ণ দীপনে নয়। আন্তর বিষয়ী ও বাহ্য বিষয়, উভয়েরই জ্ঞান তার সংকীর্ণ, আর কোন দিকেই তা সমগ্রজ্ঞান বা বিশ্বের সমগ্র ব্যাপার ও ইচ্ছাশক্তির সমষ্টির সঙ্গে একাত্ম নয়। সুতরাং তার কর্মের প্রেরণা ও ধারা দুই-ই হয় কুটিল, বহুশাখায় প্রধাবিত, বিধাখণ্ডিত ও অস্থির। সত্যের সন্ধানে সে মিথ্যার প্রান্তরে গড়া-উদ্দেশ্যে ঘোরে, সমগ্রকে গড়বার ইচ্ছায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ড চয়ন করে' বা যদৃচ্ছাক্রমে সংগ্রহ করে' সে সব একত্র করে, ন্যায়ের সন্ধানে ভ্রম ও পাপের অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়ে স্খলিতপদে বিচরণ করে। একদর্শী বা সর্বগ্রাহী দৃষ্টি তার নাই, বিশ্বক্রতুর সমগ্রতা বা সর্বাতিশায়ীর সংহত একত্বও তার নাই; সুতরাং ব্যষ্টির সংকল্প, ন্যায় ও মঙ্গলের ঋজু পথে, সত্য ও অমরত্বের দিকে চলতে পারে না। সে বাসনার দ্বারা চালিত হয়, তার চারদিক থেকে নানা শক্তির সব অভিঘাত তার উপরে আসে আর অহং ও অজ্ঞানের বাধার জন্য সে-সবের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে না, তাই সে অজ্ঞানের যন্ত্রণা, দুঃখ ও নিষ্ফলতার অধীন হয়। দিব্য সত্য ও ধর্ম তার নাই বলে দিব্য সুখও সে পেতে পারে না।

* 'সূর্যদ্বারেণ', মুণ্ডকোপনিষদ, ১।২।১১

অগ্নি, ভাগবত ইচ্ছাশক্তি

কিন্তু আমাদের স্থূল মন ও বুদ্ধির অভ্যন্তরে ও পশ্চাতে যেমন একটা দিব্য জ্যোতি আছে যা এই গোধূলি ছায়ায় মানুষের মধ্যে পরম সত্যের প্রভাত আলোর পূর্ণ বিকাশ প্রস্তুত করছে, তেমনি আমাদের সব ভ্রান্তি পাপ ও পদস্খলনের অভ্যন্তরে ও পশ্চাতে এক নিগূঢ় ইচ্ছাশক্তি আছে, যা আমাদের প্রেম ও সুসঙ্গতির দিকে প্রবর্তিত করে, সে জানে তার গতি কোন মুখে এবং আমাদের কুটিল বহুশাখ বিপথগতির প্রবেগকে প্রস্তুত করে', একমুখী করে' তাদের প্রয়াস ও সন্ধানের চরম ফল মিলবে যে সহজপথে, সে পথ ধরিয়ে দেয়। এই দিব্য-ক্রতু ও দিব্য জ্যোতির আবির্ভাবই হল অমরত্বের জন্য প্রথম প্রয়োজন।

এই দিব্যক্রতুই অগ্নি। এ উপনিষদের শেষ শ্লোক ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে, সে-বেদে অগ্নি হলেন দিব্যক্রতু বা বিশ্বে কর্মপ্রবৃত্ত চেতনার শক্তির শিখা। তাঁর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তিনি মর্ত্যজীবের অন্তরে অমর সত্তা, তিনি অধ্বরের নায়ক, পথের দিশারী, দিব্য অশ্বরূপে সে পথে আমাদের বহন করে' নিয়ে যান; "কুটিলতার পুত্র"* তিনি, নিজে ঋজু পথ ও পরম সত্য জানেন, তিনি নিজেই সে পথ ও সে সত্য। এই জগতের সব ব্যাপারের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন ও দুরবিগম্য থাকেন, কারণ সে সবই অহং ও বাসনার দ্বারা মিথ্যাতে পরিণত হয়; কিন্তু সে-সব ব্যবহার করেই তিনি সে-সব অতিক্রম করেন এবং ক্রমে আবির্ভূত হন 'অগ্নি বৈশ্বানর' রূপে, মানবের মধ্যে সার্বজনীন তত্ত্বরূপে অথবা বিশ্বজনীন শক্তিরূপে তিনি সব দেবতাদের ও সবগুলি জগৎ নিজের মধ্যে ধারণ করেন, সব বিশ্বজনীন ব্যাপারের আশ্রয় দেন এবং পরিণামে পরমদেবত্ব ও অমৃতত্ব পূর্ণসিদ্ধ করেন। দিব্যকর্মের তিনিই কর্মী। এ উপনিষদের শেষ দুই শ্লোকের অর্থ এই সব প্রতীকের দ্বারা নিরূপিত হয়।

অমর প্রাণতত্ত্ব

প্রাণ হল যে ক্ষেত্র থেকে দিব্য ক্রতু ও দিব্য আলোক আবির্ভূত হতে পারে। বেদে বলা হয়েছে যে 'বায়ু মাতরিশ্বা' বা প্রাণতত্ত্বই সুদূরে ঊর্ধ্বে পরমলোকে আসীন সূর্যের কাছ থেকে অগ্নিকে নামিয়ে আনেন। সত্যবিজ্ঞানের লোক থেকে দিব্য ক্রতুকে প্রাণ নিম্নে, চেতনের রাজত্বে আহ্বান করে আনে, এখানে প্রাণের মধ্যে তার নিজের অভিব্যক্তি প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যে। প্রাণের সব বস্তু ভোগ করে' গ্রাস করে', অগ্নি উৎপাদন করেন মরুৎদের বা প্রাণের যেসব স্নায়বিক শক্তি চিন্ময় শক্তিতে পরিণত হয় তাদের, অগ্নির আশ্রয়ে তারা প্রস্তুত

* "পুত্রো ন হার্যোর্বাঃ", ঋগ্বেদ ৩।৩।৪

করে ইন্দ্রের ক্রিয়া। ইন্দ্র হলেন প্রদীপ্ত মন, আমাদের প্রাণের সব শক্তির পক্ষে তিনিই ঋষি বা সত্য ও ধর্মের দ্রষ্টা। আচ্ছাদক বৃত্রকে বধ করে' ইন্দ্র অন্ধকার দূর করেন, আমাদের সত্তার উপর সূর্যোদয় সাধন করেন এবং সত্তার সমগ্র ক্ষেত্রের উপর বিচরণ করে' সর্বত্র সত্যের রশ্মি বিকিরণ করান। সূর্যই 'সবিতা' দ্রষ্টা বা অভিব্যক্তা, এই মরলোকে তিনিই অমর লোক বা সংস্থিতি প্রকাশিত করেন, অহংকার পাপ ও দুঃখের দুঃস্বপ্ন দূর করে' জীবনকে অমরত্ব মঙ্গল ও পরমসুখে রূপান্তরিত করেন। পরমদেবের অভিমুখে মানবজীবনের উন্নয়ন, অধি-রোহণ ও আত্ম-উন্নয়নের প্রতীক হলেন বেদের দেবতারা।

প্রাণ দেহ কর্ম সংকল্প, এই ক'টি হল আমাদের প্রথম সাধন। জড় আমাদের দেহ যোগায়, কিন্তু তা ত জগৎশক্তিতে একটা সাময়িক গ্রন্থি মাত্র, পরমপুরুষ তাতে অধিষ্ঠান করে' প্রাণতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত সব ক্রিয়াবৃত্তির অধ্যক্ষতা করেন। প্রাণ-তত্ত্বের দ্বারা পরিত্যক্ত হলেই তার সংহতিভেদ হয়, তখনই তার পরিণাম। সুতরাং দেহ আমাদের সত্তা নয়, একটা আয়ুধ বা যন্ত্র মাত্র। কারণ জড়তত্ত্বের প্রকৃতিই হল বিভাজন ও তামসিকতা, জন্ম ও মৃত্যু, সংগঠন ও সংহতিভেদ। মৃত্যুর জয় সে ঘোষণা করে। অমর মানবের পক্ষে দেহের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে করা চলবে না।

আমাদের উপাদানের মধ্যে প্রাণতত্ত্ব মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকে। এ হল 'অমর নিঃশ্বাস বায়ু ('অনিলং অমৃতং'), আর তার প্রকৃত তাৎপর্য হল, জন্মমৃত্যুর নিয়মের ঊর্ধ্বে অবস্থিত অস্তিত্বের সূক্ষ্ম শক্তি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে জন্মমৃত্যু প্রাণেরই ধর্ম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, জন্মমৃত্যু জড়ের বা দেহেরই প্রক্রিয়া। দেহের উদ্ভবে বা বিলয়ে প্রাণতত্ত্বের উদ্ভব বা বিলয় হয় না তা যদি হত তবে ব্যষ্টি সত্তার প্রগতির ধারাতে ছেদ পড়ত এবং মৃত্যুর পরে সবারই আবার নিরাকারে প্রত্যাবর্তন করতে হত। প্রাণ দেহ গঠন করে, দেহের দ্বারা গঠিত হয় না। প্রাণের সূত্র দিয়েই আমাদের দৈহিক জীবন-পরম্পরা অমর-চ্ছিন্নরূপে গ্রথিত, শুদ্ধ এই কারণেই যে প্রাণ নিজে অমর। নশ্বর দেহের সে সহযোগী এবং মনোময় সত্তাকে বা মনে অধিষ্ঠিত পরমপুরুষকে তার প্রগতির পথে সে বহন করে' নিয়ে যায়।

সংকল্প ও স্মৃতি

সে যাত্রা হল এই জগতে এক জীবন থেকে অন্য জীবনে অনুক্রমী কর্মপরম্পরা, আর তার অবকাশে অপর কোন সংস্থিতিতে (বা লোকে) জীবন ধারণ। প্রাণতত্ত্বই সে কর্ম-পরম্পরা পোষণ করে, মূর্তনের যে শক্তি তার মধ্যে গড়ে ওঠে, কর্মের উপাদানরূপে সে শক্তি সে-ই যোগায়। কিন্তু তার অধিষ্ঠাতা দেবতা প্রাণতত্ত্ব নয়, ইচ্ছাশক্তি। সংকল্পই 'ক্রতু' বা

কর্মের পশ্চাতে কার্যকরী শক্তি। চেতনার সমধর্মী সে চেতনারই সে শক্তি, এবং চেতন-অবচেতন-অতিচেতন, জৈব-দৈহিক-মানসিক, সব বিগ্রহে বর্ত্তমান থাকলেও, মনে যখন আবির্ভূত হয় তখনই সে তার স্বকীয় রূপপটে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনের একটী বৃত্তি, স্মৃতির সাহায্যে সব কর্ম একসূত্রে গ্রথিত করে' বাহ্যির লক্ষের দিকে সে পরিচালিত করে।

মানুষের মধ্যে মানস সংকল্পের দ্বারা চেতনার প্রবোধে ত্রুটি আসে স্মৃতি-শক্তির সংকীর্ণতার জন্য। আমাদের ক্রিয়া যেমন বিক্ষিপ্ত তেমনি সীমাবদ্ধ হয়, কারণ মন নিয়ে আমরা কালপ্রবাহের প্রতিক্ষণে বাস করি, এবং আমাদের অহংভাবিত মনের কাছে যা আশু প্রয়োজন বোধ হয় বা সে মনকে যা আকর্ষণ করে' আমরা শুধু তাই ধরে থাকি। যা করছি তাতেই আমরা নিবিষ্ট থাকি, যা করা হয়ে গেছে সে-সব আমরা নিয়ন্ত্রণ করিই না বরং আমরাই স্মৃতিচ্যুত অতীত কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই। তার কারণ, আমরা কর্মের মধ্যে ও কর্মফলেই অভিনিবিষ্ট থাকি, আত্মাতে অধিষ্ঠিত হয়ে পশ্চাৎ থেকে কর্মস্রোত নিরীক্ষণ করি না। ঈশ্বর বা সত্য সংকল্প কর্মপ্রবাহের বাইরে অবস্থান করেন, তাই তিনি সব কর্মের প্রভু, কর্মের অধীন নন।

এ উপনিষদে 'ক্রতু'কে বা সংকল্পকে, দেবতারূপে আহ্বান করে' তাকে অনুষ্ঠিত সব কর্ম স্মরণ করতে উপরোধ করা হয়েছে, যাতে সে ভবিষ্যৎ সম্বৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তার আধার হতে পারে এবং শুদ্ধ মাত্র অনুপ্রেরণা ও আত্মরূপায়ণের শক্তি না হয়ে জ্ঞান ও আত্ম-লাভের শক্তিও হতে পারে। তাহলেই ক্রমশঃ সে সত্যসংকল্পের অনুরূপ হতে পারবে এবং ভবিষ্য জন্মপরম্পরা সজ্ঞানে নিয়ন্ত্রণ করে' যথাযথরূপে তার সমন্বয় বিধান করতে পারবে। এখনকার মত, যেন বায়ুর দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে জন্ম থেকে জন্মান্তরে বাঁকা পথে না ঘুরে, অধিকতর সুনিশ্চিত অনুক্রমে, অধিকতর জ্ঞানের ও নিয়ন্ত্রণের শক্তি নিয়ে এক জন্মের সঙ্গে অন্য জন্ম গ্রথিত করে', অপেক্ষাকৃত ঋজুপথে অগ্রসর হতে পারবে; আর পরিণামে, পূর্ণজ্ঞানময় সংকল্পরূপে সেই জ্ঞানদীপ নিয়ে সরল পথে মৃত্যুহীন পরমসুখের পানে চলতে সক্ষম হবে। মানসিক সংকল্প যা এখন সে যার প্রতীক, সেই দিব্য সংকল্পে, অগ্নিতে, পরিণত হবে।

সংকল্প ও জ্ঞান

দিব্য সংকল্পের স্বরূপ হল যে তাতে চেতনা ও শক্তি, জ্ঞান ও বল অভিন্ন। সব অভি-ব্যক্তি, সব জগতে যা কিছু জন্মগ্রহণ করে, সবই সে জানে। 'জাতবেদা' সে, সব জন্মের যথাযথ জ্ঞান তার আছে। সবের সত্তার মর্ম, অপর যা কিছু জন্মেছে সে সবের সঙ্গে প্রত্যে-কের সম্বন্ধ, উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াপদ্ধতি, সবের গতিপথ ও গন্তব্যস্থান, সবের সঙ্গে প্রত্যেকের

একত্ব ও পার্থক্য—সব দিক থেকেই সববস্তু তার জানা। এই দিব্য সংকল্পই বিশ্ব পরিচালনা করে; যে সব বস্তু সে সংযোজন করে সে সবের সঙ্গেই সে একাত্ম, এবং তার সত্তা জ্ঞান এবং ক্রিয়া পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। সে যা তা সে জানে; সে যা জানে তা সে করে এবং তাতে সে পরিণত হয়।

কিন্তু অহংভাবিত চেতনা আবির্ভূত হয়ে বিশ্বব্যাপারে যেই হস্তক্ষেপ করে অমনি একটা বিক্ষোভ, একটা বিভাজন, একটা মিথ্যাক্রিয়া আসে। সংকল্প তার নিখুঁত উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে অন্ধ একটা প্রেরণাতে পরিণত হয়, জ্ঞান একটা মিথ্যাহত আংশিক আলোকরশ্মিতে পরিণত হয় এবং সংকল্প ঘটনা ও পরিণামের উপর স্বামিত্ব হারিয়ে কেবলমাত্র সে সব অধিকার ও অনুপ্রাণিত করতে প্রয়াস করে। কারণ, আমরা 'আত্মবান' থাকি না, প্রকৃত আত্মাকে না নিয়ে অহংকে স্বীকার করি। আমরা জানি না আমরা কি, যা জানি তা কার্যে পরিণত করতে পারি না। কারণ, জ্ঞান প্রকৃত হয় এবং কর্ম সত্যজ্ঞানের অনুযায়ী হয় তখনই, যখন জ্ঞান ও কর্ম, স্বাভাবিকভাবে, প্রবুদ্ধ প্রদীপ্ত ও আত্মবান যে জীবের সত্তা জ্ঞান ও কর্মের গতি অভিন্ন, তার অভ্যন্তর থেকে স্বতঃ নিঃসৃত হয়।

দিব্যসংকল্পের নিকট আত্মসমর্পণ

এ পরিবর্তন আসে, মানস সংকল্প দিব্য সংকল্পের ক্রমশঃ অনুরূপ হবার ফলে যখন অগ্নি আমাদের মধ্যে প্রজ্বলিত হয়। ক্রমবর্ধমান সেই জ্ঞান ও বলই কুটিল পথ ছাড়িয়ে পরিশেষে আমাদের সরল বা ঋজু পথ ধরিয়ে দেয়। দিব্য জ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম এই দিব্য সংকল্পই আমাদের পরম সুখের ও অমরত্বের পানে পরিচালিত করে। যা কিছু অহংএর বিপথগতির অঙ্গীভূত, যা কিছু দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে মিথ্যা প্রলোভন ও বাধাপ্রমাদে ভরা মিথ্যার এপথে ওপথে, ঘটনার চাপে বা প্রলোভনের টানে নিয়ে যায়, সে সবই আমাদের কাছ থেকে সেই দূরে সরিয়ে দেয়। সংকল্পের দিব্যভাবে রূপান্তর হলে এ সবই দূর হয়, আমাদের চেতনাতে আর তারা বাসা বাঁধতে পারে না।

সুতরাং, সহজভাবে কর্ম করবার লক্ষণ হল, ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে ও পরিণামে সম্পূর্ণরূপে, ব্যষ্টির মধ্যে সূর্যালোকে আবিষ্কৃত দিব্য সংকল্পের কাছে ব্যষ্টিসংকল্পের ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে ও পরিশেষে সম্পূর্ণ আনুগত্য। ব্যষ্টির চেতনাতে অভিব্যক্ত হলেও এ সংকল্প ব্যষ্টিসত্তার নয়। এ হল সর্বান্তর্যামী ও সর্বাতীত পরমপুরুষের সংকল্প, ঈশ্বরের ইচ্ছা। সম্পূর্ণ আত্মচেতন সত্তাতে ঈশ্বরকে পরম অধিতীয়রূপে জানা এবং সম্পূর্ণ আত্মসংবেদী করে সর্বময় ও সর্বাতীত রূপী ঈশ্বরের অনুগত হওয়া, এই দুটি হল স্বর্গের দরজার চাবি, অমৃতলোকে প্রবেশের অধিকারপত্র।

আর এ দুইয়ে মিলিত হলে তার স্বরূপ হয় জ্ঞানদীপ্ত ভক্তি, যা মানবজীবনের মধ্যে ভগবানকে স্বীকার করে, তাঁর জন্য আকুল হয় এবং তাঁকে উপলব্ধি করে।

উপসংহার

বিচারের তৃতীয় প্রবাহের বিষয় ছিল, অন্তরে আনন্দ ও সত্যের অবস্থা এবং মৃত্যুর পরে জ্যোতির্ময় সব লোক লাভ করা, আর পরিণামে, স্বয়ংপ্রভ পরম অদ্বিতীয়ের সঙ্গে একাত্মতা ; আর এখানে, চতুর্থ প্রবাহে, মনোবৃত্তির দিক থেকে সেই অমরত্ব লাভের বিবিধ সাধন নির্দেশ করা হল। আবার, দ্বিতীয় প্রবাহের বিষয় ছিল আত্মজ্ঞান এবং পরমাত্মার ও তাঁর সব সম্ভূতির সঙ্গে একাত্মভাব অর্জনের পদ্ধতি, এবং প্রথম প্রবাহের শেষে ছিল মুক্ত কর্মের আদেশ ; আর সে সবই এখানে বৈদিক রূপকের সাহায্যে ব্যষ্টির পক্ষে বিশেষিত করে' বলা হল। সুতরাং এখানে এই চতুর্থ প্রবাহে, এ উপনিষদ তার উপযুক্ত সমাপ্তি ও সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

দিব্য-জীবন

[অবতরণিকা]

অনির্বাণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

২৯

জন্মান্তর-তত্ত্ব

কালগতি অবিশ্রান্ত বাঁধন খসে পড়লে আমাদের মাঝে অমরত্বের বোধ জাগে, একথা আগে বলেছি। এ-অমরত্ব কার? দেহের যে নয় তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে. দেহের যেমন জন্ম আছে, তেমনি মরণও আছে। বলা হয় অমরত্ব আত্মার—যিনি দেহের অন্তর্যামী হয়েও তার অতীত। দেহ মরলে পরেও দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব থাকে। কোথায় থাকে?—ইহলোকে নয়, লোকান্তরে।

অমরত্বের ভাবনাকে আশ্রয় করে তাহলে দুটি সিদ্ধান্ত দেখা দিচ্ছে—জীবের অনাদি-অনন্ত অস্তিত্ব, আর তার লোকান্তর-স্থিতি। এবার এই সিদ্ধান্ত দুটি যাচাই করে নেবার সময় এসেছে, তা না হলে জীবের চিন্ময় অধ্যাত্মপরিণামের রীতিটি ঠিক বোঝা যাবে না।

মানুষ মরতে চায় না। জীবনটা আঁকড়ে থাকবার এই প্রবৃত্তি সব জীবের মাঝেই আছে, আত্মরক্ষার একটা সহজ সংস্কাররূপে। তাহলেও এক্ষেত্রে পশুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ এই, মৃত্যু সম্পর্কে পশুর কোনও সুস্পষ্ট প্রাক্তন কল্পনা নাই, কিন্তু মানুষের আছে। আত্মসচেতনতার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ সত্তার অস্তি-নাস্তি দুটো দিকই দেখতে পায় এবং প্রথমত অস্তির ভাবনাকে প্রলম্বিত করে নাস্তিত্বকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। তারপর নাস্তির মাঝ থেকেই অস্তির প্রচ্ছুরণের (projection) ভাবনা করে এবং অবশেষে অস্তি-নাস্তি দুয়েরই ওপারে চলে যায়। অবশ্য অধ্যাত্ম-চেতনার এটি একটি পরম অবস্থা।

প্রাকৃত-মন অতদূর ভাবতে পারে না। সে তার মৃত্যুর পরেও এই প্রাকৃত জীবনেরই একটা জের টেনে চলতে চায়। মরে গিয়েও সে ফুরিয়ে যাবে না, এখানে তার যে-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হল না, পরে আর-কোথাও তা চরিতার্থ হবে—এমন একটা আশা সে রাখে। কিন্তু

কোথায় হবে? এক হিন্দু এবং বৌদ্ধ ছাড়া আর-সব ধর্মের লোকেরই বিশ্বাস, ইহজন্মের জের চলবে লোকান্তরে। কেবল হিন্দু আর বৌদ্ধরাই বলে, জের চলবে শুধু লোকান্তরে নয়, ইহলোকেও অর্থাৎ যে-জীব মরে লোকান্তরে গেছে, সে আবার ওখান থেকে এখানে ফিরে আসবে, আবার তার জন্ম হবে। পৃথিবীতে এই তার প্রথম জন্ম বা শেষ জন্ম নয়—বহুবার সে এখানে জন্মেছে, আরও বহুবার জন্মাবে। তার এই জন্ম-জন্মান্তরে যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কর্ম দিয়ে। একদিন কর্ম ফুরিয়ে যাবে, তখন সে আর এ-জগতে ফিরে আসবে না, যে ব্রহ্ম-চৈতন্য থেকে তার উদ্ভব হয়েছিল, তাতেই আত্মার সে লয় হয়ে যাবে: 'জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।'

এই জন্মান্তরবাদ আর্যভাবনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেমিটিক একজন্মবাদের চাইতে এর যৌক্তিকতা বেশী তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহলেও জন্মান্তর-রহস্য এবং তার আনুষঙ্গিক কর্মবাদকে আবার নতুনভাবে যাচাই করে দেখবার প্রয়োজন আছে, কেননা প্রাকৃতভাবনার আওতায় পড়ে এ-দুটি সিদ্ধান্তের তত্ত্বরূপের অনেক বিকার ঘটেছে। তাদের সংস্কার হওয়া দরকার।

একেবারে গোড়া ঘেঁষেই প্রসঙ্গটা শুরু করা যাক। প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) প্রথমেই বলবেন, আত্মার অমরত্ব কল্পনা একটা আশার মরীচিকা। জীবজন্ম প্রাকৃত ঘটনা-পরম্পরারই একটা পর্ব যখন, তখন হেতুরূপে তার একটা আদি এবং পরিণামরূপে তার একটা অন্ত যে আছে, যুক্তির দিক থেকে তা স্বীকার করতে বাধা নাই। কিন্তু এই হেতু-পরিণামের ধারাকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করা ভুল। পিতামাতার বীজ থেকে সন্তানের জন্ম হচ্ছে, সে-সন্তান পুষ্ট হয়ে আবার ছেলেমেয়ের মাঝে নিজের বীজসত্তাকে রেখে যাচ্ছে। এমনি করে প্রাণশক্তির একটা অবিচ্ছেদ ধারা, ধরা যাক্ ক্রমিক উৎকর্ষের দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে মৌল শক্তির ধারা যে অবিচ্ছেদ, তা স্বীকার করতে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু পর্বে-পর্বে যে ব্যক্তি-সত্ত সে-ধারার বাহন হল, তার অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তি স্বীকার করবার দরকার কি? সুতরাং অমরত্ব যদি কোথাও থাকে, তাহলে সে আছে শুধু জাতির, ব্যক্তির নয়—সমষ্টির, ব্যষ্টির নয়। পিতৃপুরুষ থেকে উত্তরাধিকাররূপে আমি যা পেয়েছি, তার উৎকর্ষ-সাধনার পর সন্তানে তা সঞ্চারিত করে ফুরিয়ে গেলাম—আমার দায় চুকে গেল। এমনি করে ব্যক্তির অবচ্ছিন্ন উদয়-বিলয়ের ভিতর দিয়েই জাতির অনবচ্ছিন্ন প্রগতি সিদ্ধ হচ্ছে। সুতরাং অমরত্বের দাবি যদি কেউ করতে পারে তো জাতি, ব্যক্তি নয়।

এই ধরনের চিন্তা উপনিষদেও পাওয়া যায়—অবশ্য অস্তিত্ব-রহস্যের প্রাথমিক পাঠ-রূপে, চরম সিদ্ধান্তরূপে নয়। প্রাণ-লীলার নীচের ভূমিতে 'আত্মন্-বিত্তম্' বলে একটি

তৃতীয় স্থানের কথা উপনিষদও বলেছেন, যেখানে শুধু জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন ছাড়া আর-কিছুই লক্ষ্য হয় না। যমের কাছে যাওয়ার মুখে নচিকেতার চোখের সামনেও ঠিক এই ছবিটিই ভেসে উঠেছিল—শস্য যেমন জন্মাচ্ছে পাকছে ঝরে পড়ছে আবার জন্মাচ্ছে, তেমনি সর্বত্র মর্ত্যলীলার একটা আবর্তনই চলছে। কিন্তু নচিকেতার দৃষ্টি চলে গিয়েছিল এই প্রাকৃত আবর্তনেরও ওপারে—সাম্পরায়ের মহারহস্যের পানে।

বস্তুত প্রশ্নটার মীমাংসা নির্ভর করছে ব্যক্তিসত্তের মূল্যের ওপরে। প্রত্যক্ষবাদী তাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দেননি, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে মোটেই আমল না দিয়ে তাকে তিনি জাতীয় প্রকৃতির অবশ সাধনরূপে কল্পনা করেছেন। অথচ জাতীয় সত্তার যদি কোনও বাস্তবরূপ থাকে তো তা ব্যক্তির চেতনাতেই ফোটে। জাতির অস্পষ্ট ভাবনাকে ব্যক্তিই নিজের অনুভবে সুস্পষ্ট করে তোলে, জাতির ভবিষ্য প্রগতির স্বপ্নও সে-ই দেখে। সেই সঙ্গে-সঙ্গে জাতীয় সত্তার ভাবময় রূপটিকে সে-ই আত্মসত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে এক বলে অনুভব করে, সম্ভাবিত জাতীয় ভাব বাস্তবতার মূল্য পায় তারই বেদনায়।

সমষ্টির ভাবনায় ব্যষ্টিচেতনার এই-যে বিসর্জন, বলতে গেলে এইখান থেকে আধ্যাত্মিকতার শুরু। আর এ-ব্যাপারের মূলে রয়েছে প্রাণেরই বৃহৎ হওয়ার আকুতি। এ যেন বীজের বনস্পতি হওয়ার তপস্যা। ব্যক্তি-স্বার্থের নাগপাশে যে-অহং কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল, প্রাণেরই তাগিদে সে ক্রমে ছাড়া পেল পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে—ছাড়া পেল বিশ্বের সর্বভূতে, বিশ্বোত্তরের উত্তুঙ্গ বৈপুল্যে। এমনি করে বৃহৎ হওয়াই হল আত্ম-আবিষ্কারের সাধনা, তাই সর্বধর্মের বীজ। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বমানবের কল্যাণসাধনায় আমাদের প্রচোদিত করে যে-ধর্মবুদ্ধি, তার প্রেরণা আসে এই বৃহত্তের ভাবনা হতে। এ-ভাবনা যখন আপন উল্লাসে স্ব-তন্ত্র এবং বস্তুনিরপেক্ষ হয়ে দেখা দেয়, তখন আমরা সত্তার যে নির্বিশেষ মহিমা প্রত্যক্ষ করি, তাই অধ্যাত্মবাদীর ব্রহ্ম, আত্মা বা ভগবান। এই প্রত্যক্ষেই ব্যক্তিত্বের চরম সার্থকতা।

এই প্রত্যক্ষের সঙ্গে আত্মসচেতনতার একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। আমাদের চেতনা যে শুধু বাইরটা দেখে তা নয়, অন্তরের দিকেও সে তাকায়। বাইরের দেখাটা যত গুছিয়ে আসে, অন্তরের অনুভবও ততই দানা বাঁধতে থাকে। এমনি করে ব্যক্তিসত্তকে কেন্দ্র করে উদ্বুদ্ধ চেতনায় একটা শতচ্ছন্দোময় প্রত্যক্‌দৃষ্টির জগৎ গড়ে ওঠে। অনন্ত ব্যক্তির অনন্ত জগৎ—একই অখণ্ড বৃহৎ চৈতন্যের অনন্ত বিভূতির বিস্তার। মূলের অখণ্ড চৈতন্য যেমন সত্য, তেমনি তার এই বিভূতিও সত্য। দার্শনিক পরিভাষায় ব্রহ্ম জগৎ ও জীব তিনই সত্য। কিন্তু একথা সব দর্শন স্বীকার করে না।

সাংখ্যের একটা অনন্ত মূল শক্তি মানে, কারণ এটা বুদ্ধির একটা স্বাভাবিক প্রত্যয়। কিন্তু এই মূল শক্তি না চৈতন্য না শূন্য, তা নিয়ে মতভেদ আছে। প্রত্যক্ষবাদী বলবেন, বিশ্বের

মূলে এক দুর্জ্ঞেয় অনির্বচনীয় অনন্ত এবং শাশ্বত শক্তি আছে, কিন্তু তার বিভূতি সান্ত এবং অশাশ্বত। অর্থাৎ বিশ্বশক্তি শাশ্বত, কিন্তু জীবশক্তি অশাশ্বত। চিদ্‌বাদীরও এই মত; কেবল জীবশক্তিতে চিতের খেলা দেখা যায় বলে তার উৎসকে তিনি বলেন চিৎশক্তি। শূন্য-বাদী বলেন জীব-চৈতন্য রূপের জগৎ থেকে অরূপের জগতে অভিযান চালিয়ে শেষ পর্যন্ত খেই হারিয়ে ফেলে, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে অবশেষে আর-কিছুই থাকে না, সুতরাং বিশ্বমূল শূন্যমাত্র।

প্রত্যক্ষবাদী শাশ্বত বিশ্বশক্তি মানছেন, কিন্তু শাশ্বত বিশ্বচৈতন্য মানছেন না। তাঁর দৃষ্টিতে চৈতন্য শক্তির একটা উপসৃষ্টিমাত্র। সুতরাং মৃত্যুর পরও জীবচৈতন্যের অনুবৃত্তি তিনি স্বীকার করেন না। তাই তাঁর মতে পরলোক ও জন্মান্তরের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কৃতকর্মের ফের টানবার জন্য ব্যক্তিসত্তের স্থায়িত্ব কল্পনারও কোনও দরকার আছে বলে তিনি মনে করেন না। ওগুলো দেহধর্ম, দেহের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে ওগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়।

কিন্তু ব্যক্তিসত্তের প্রত্যয় যদি ব্যাপক এবং গভীর হয়, তাহলে আত্মোন্মেষের একটি পর্বে এসে চৈতন্যকেই অনুভব হয় বিশ্বমূল বলে। ঠিক এই অনুভবটি সবার হয় না, তথা-কথিত অনেক আস্তিকের বেলাতেই এটা একটা শোনা কথা মাত্র। আত্ম-প্রত্যয় অগভীর বলে পরলোক ও জন্মান্তর সম্পর্কে তারাই নানা অযৌক্তিক কল্পনা-জল্পনার সৃষ্টি করে, যথাস্থানে আমরা তার সমালোচনা করব।

অন্তর্মুখ হয়ে সত্তার গভীরে ডুবে একটা শাশ্বত আত্মপ্রত্যয়কে যাঁরা অনুভব করেছেন, আত্মার অমরত্বের কথা তাঁরাই বলছেন। কিন্তু অমরত্বের সিদ্ধান্ত থেকে তাঁদের দর্শনে যেসব উপসিদ্ধান্ত দেখা দিয়েছে সেগুলোর মাঝে মিল নাই। মোটামুটি এই উপসিদ্ধান্তগুলিকে সেমিটিক এবং আর্য এই দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সেমিটিক ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত উপসিদ্ধান্তে আত্মা অমর হলেও পৃথিবীতে তার এই একবার মাত্র আসা, মৃত্যুর পর লোকান্তর-স্থিতি সম্ভব হলেও তার জন্মান্তর হয় না। কর্মফল এঁরাও স্বীকার করেন, কিন্তু তার হিসাব করেন ঈশ্বরের দণ্ড-পুরস্কারের নীতি দিয়ে। কিন্তু তাতে আকস্মিক জীবজন্মের হেতু কিংবা ঈশ্বরবিধানের সঙ্গে জীবের আপন কর্মদায়ের সম্পর্কটা পরিষ্কার হয় না।

আর্যভাবনায় আত্মার অমরত্বের সঙ্গে-সঙ্গে জন্মান্তরও স্বীকার করা হয়েছে, তার কর্ম-বাদের সিদ্ধান্তও বেশ যুক্তিযুক্ত। তার মতে জীবজন্ম আকস্মিক নয়, তার একটা পূর্ব ইতিহাস আছে এবং উত্তরপরিণামও আছে। অবিদ্যার বন্ধন দিয়ে জীবজন্মের শুরু এবং বিদ্যার উন্মেষে আত্মমুক্তির ফলে তার সমাপন। অবিদ্যার আদি নাই, কিন্তু অবসান আছে। অবসান পরমতত্ত্বের উপলব্ধিতে। সে-তত্ত্ব বেদান্তের মতে সদ্‌ব্রহ্ম, বৌদ্ধমতে অসৎ বা

শূন্য। যে-পর্যন্ত এই পরমতত্ত্বে জীব না পৌঁছতে পারছে, সে-পর্যন্ত এই পৃথিবীতে তাকে বারবার আসতে হয়। এ-আসাটা নিয়ন্ত্রিত হয় তার কর্মের দ্বারা। জড়জগতের আইনের মতই অন্তর্জগতে কর্মের আইনের মধ্যে ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে জীবের খানিকটা স্বাতন্ত্র্য আছে। আগুনে হাত দিলে জড়ের নিয়মে হাত পুড়তে থাকবে এবং চেতনার নিয়মে আমারও অনুভব হবে—এ-নিয়মের নড়চড় নাই। কিন্তু আমি আগুনে হাত দেব কি না, সেটা আমার ইচ্ছা। তবে আমি ইচ্ছা না করলেও অনেক সময় আগুনে হাত পড়ে যায়। বিশ্বের বিধান এবং আমার ইচ্ছার মধ্যে তখন বিরোধ দেখা দেয়। জীবনের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা এই, বিশ্বের অন্ধবিধানের কাছে আমার ইচ্ছা বারবার হার মানে। ইচ্ছার এই পরাভব দুঃখের কারণ। অনেকে বলেন, এই দুঃখের পরিমাণটাই জগতে বেশী। বাসনার তর্পণ আর কতটুকু হয়, হলেও সে-তৃপ্তির মেয়াদই-বা কত-টুকু? বস্তুত জগৎটা দুঃখময়। অথচ বাসনার পুরোচনায় এই দুঃখেরই মাঝে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি—এই আমাদের মোহ। উটের মত কাঁটাগাছ চিবোতে গিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে, তবুও তার লোভ আমরা ছাড়তে পারি না। অনেক দুঃখে এটা বুঝতে পারি যখন, তখন বাইর থেকে অন্তরের দিকে মুখ ফেরাই। তখন দেখি, অন্তরে ডুবলেই সুখ-দুঃখের দোলা হতে নিষ্কৃতি। এ-ডোবাটা ক্রমে একটা নেশার মত পেয়ে বসে। তখন জগৎ হতে মুখ ফিরিয়ে অন্তরের পথ ধরে চলতে থাকি,—পাই একটা সুগভীর অবিচল শান্তি, নিস্তরঙ্গ চেতনার এক আশ্চর্য স্বচ্ছতা, অনিবার্য অস্তিত্বের এক অন্তর্গূঢ় আনন্দ-সংবেদন, এক অপরূপ নির্মাম নিষ্কিঞ্চিনতায় সত্তার পরিনির্বাণ। এই হল পরমতত্ত্ব, এইখানে পৌঁছনই আমাদের পুরুষার্থ। এখানে জগৎ নাই, তার ঝামেলাও নাই। পথের কাঁটা মাড়িয়ে সংসারের দীর্ঘ অরণ্য পেরিয়ে আসছি এইখানে পৌঁছবার জন্য। এতকাল ধরে পথের মাঝে-মাঝে জন্ম-জন্মান্তরের আবর্ত রচনা করে এসেছি, এবার এলাম মনোবুদ্ধির পরম ধামে, আর আমায় সংসারে ফিরে যেতে হবে না।

এই মতবাদে জীবের উত্তরায়ণের একটা ধারাবাহিক ছক পাওয়া যায়। নিজের চেষ্টায় অধ্যাত্মচেতনার এক উত্তুঙ্গ শিখরে তাকে পৌঁছতে হবে, তার জন্য একটা জন্মই তার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে না—এই সঙ্গত যুক্তির পাকি এ-সিদ্ধান্তের মূলে প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থাৎ সিদ্ধির গুরুত্বের সঙ্গে সাধনকালের মেয়াদের একটা অনুপাত আমরা এখানে পাই। কিন্তু সেইসঙ্গে আর-একটি জিনিসের নৈশ্চিত্য পাওয়া দরকার—সে হচ্ছে ব্যক্তিত্বের শাশ্বতত্ব। অবিদ্যার গহন হতে বিদ্যার আলোয় যে উত্তীর্ণ হচ্ছে, জন্ম-জন্মান্তর অতিবাহনের মাঝে তার সত্তার আর শক্তি-পরিণামের ধারাবাহিকতার একটা নৈশ্চিত্য থাকা চাই। কিন্তু বৌদ্ধমতে এবং আধুনিক বেদান্তমতে পরমার্থতত্ত্বের সঙ্গে প্রাতিভাসিক জগতের বিরোধ আছে।

উভয় মতেই জগৎ একটা বিভ্রম সুতরাং তার অন্তর্গত জীবের জীবত্বও বিভ্রম। এক্ষেত্রে জীব শাশ্বত নয়, অতএব অমরত্বও তার নয়, তার মধ্যে যে নির্বিশেষ চৈতন্য অধিষ্ঠিত রয়েছে, অমরত্ব তারই। অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যই অমৃত, কিন্তু সংসারী (moving from birth to birth) জীব অমৃত নয়। বস্তুত এই জীবসত্বের কোনও তাত্ত্বিকতা নাই।

আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তের মাঝে অযৌক্তিকতার বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু যে-অভ্যুপগমের (postulate) উপর এর ভিত্তি, তার মাঝে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অমৃতত্ব একটা অধ্যাত্ম-অনুভবের অবস্থা। এ-অনুভব পেতে গেলে অনেক মৃত্যু পেরিয়ে সংসারের উজানে যেতে হয় সত্য। তাবলে শেষ পর্যন্ত সংসারের সঙ্গে চরম বিচ্ছেদই যে তার পরম অর্থ, তা কিন্তু সত্য নয়। ব্রহ্ম জগৎকে পেরিয়ে গেছেন, কিন্তু তবুও ব্রহ্ম জগৎ ছাড়া নন। এ-জগৎ তাঁর সম্ভূতি এবং সেই সম্ভূতির আনন্দেও তিনি অমৃত হয়ে আছেন। জীব যদি স্বরূপে এবং শক্তিতে ব্রহ্মেরই বিভূতি হয়, তাহলে উজান বেয়ে মৃত্যুতরণ অমৃতত্বের অনুভবের সঙ্গে ভাটির স্রোতে সম্ভূতির অমৃতত্বও সে অনুভব করবে। কালের বিচারে কালাতীত শাশ্বত যেমন সত্তার একটা দিক, তেমনি কালগত শাশ্বতত্বও সত্তার আর-একটা দিক। একদিকে সত্তা শিবস্বরূপ, আর একদিকে শক্তিময়। বস্তুত শিবেরই শক্তি, দুয়ের মাঝে বিরোধকল্পনা দ্বৈতবুদ্ধির বিভ্রম মাত্র।

সম্ভূতির অমৃতত্ব যদি স্বীকার করি, তাহলে জগতের সত্যতার সঙ্গে-সঙ্গে জীবসত্বের তাত্ত্বিকতাও সম্ভাবিত হয় এবং সংসারী জীবের মাঝেও কালগত শাশ্বতত্বকে অবলম্বন করে অমৃতত্বের আর-একটা ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। বস্তুত এ-অমৃতত্ব নির্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যের বা কূটস্থ চৈতন্যের অমৃতত্ব নয়—সংসরণশীল জীব-চৈতন্যেরই অমৃতত্ব। এই জীব-চৈতন্যকে আমরা অন্যত্র বলেছি চৈত্য-পুরুষ ইনি প্রাকৃত জীব এবং কূটস্থ চৈতন্যের মধ্যে অমৃতের সেতু। জীবত্বের যে-অংশ অপরা-প্রকৃতির কবলিত, তা অবশ্যই মৃত্যুর অধীন; কিন্তু যে-অংশে সে পরা-প্রকৃতি, সে-অংশ অমৃত। অথচ তা নির্বিশেষ স্থাণুস্বরূপ নয়, অমৃতের কলায়-কলায় নিত্য উন্মিষন্ত। যা-কিছু কালগত তাই নশ্বর এবং যা কালাতীত তাই শাশ্বত,—এ-সিদ্ধান্ত সনাতন নয়। কালাতীত শাশ্বতেরও একটা নিত্য সম্ভূতি আছে। তাই হল সত্তার চিৎশক্তিময় ভাবরূপ। এই ভাব স্ফুরন্ত (dynamic) অমৃত হয়েই মৃত্যুপাশিত বস্তুর আবর্তনে আত্মপ্রকাশ করে। জীবের চৈত্যসত্তা এই অমৃত ভাবোল্লাসের বাহন।

প্রাচীন ঔপনিষদসিদ্ধান্তে ব্রহ্মের সম্ভূতি সত্য, সুতরাং জগৎ ও জীবও সত্য। কিন্তু তাহলেও জীবের তাত্ত্বিকতা সেখানে কালাবচ্ছিন্ন (temporal)। অবিদ্যা এবং বাসনা জীবের জন্মের হেতু। ব্রহ্মের চিৎসমুদ্রে জীব জাগছে বুদ্বুদের মত; অবিদ্যার নিবৃত্তিতে এবং বাসনার বিলয়ে সে-বুদ্বুদ আবার ব্রহ্মেই বিলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে যে এমনি করে বুদ্বুদ

জাগছে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে, এটা সমুদ্রের সিসৃক্ষার (creative urge) উল্লাস। সমুদ্র সিসৃক্ষা এবং বুদ্বুদের উদয়-বিলয় সবই সত্য হতে পারে, কিন্তু তাতেও একটি বুদ্বুদই যে বার-বার জাগছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে এ-কল্পনার কোনও প্রয়োজন হয় না, যতক্ষণ জীবের অন্তর্গূঢ় সত্তাকে ব্রহ্মের আত্মরূপায়ণের একটা অপরিহার্য নিত্য ভঙ্গিমা বলে স্বীকার না করি। তাই উপনিষদসিদ্ধান্তে জগৎ ও জীবের সত্যতা স্বীকৃত হলেও জন্মান্তরবাদকে সেখানে অপরিহার্য বলবার কোনও হেতু পাওয়া যায় না।

পূর্ণাদ্বৈতবাদে চৈত্যসত্তার স্বীকৃতিতে এই ন্যূনতার পূরণ হয়। প্রাকৃত মর্ত্য জীব-সত্ত্ব আর জীবের কূটস্থ অমর্ত্য সত্তা দুয়ের মাঝে চরিষ্ণু অথচ শাশ্বত শুদ্ধ জীবসত্ত্বকে মানলে পরেই জন্মান্তরবাদের একটা গভীর সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। কর্ম এবং বাসনাক্ষয়ের জন্য জীব বারবার জন্মগ্রহণ করছে—এই প্রচলিত সিদ্ধান্ত হতে বিশ্বব্যাপারের কোনও অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য কিংবা কেন জীব তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলে না। সংসার কতকগুলি জটিল ব্যাপারের নক্সাহীন আবর্তনমাত্র, আর জীব যকস্মাৎ এই আবর্তের মাঝে পড়ে গিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে এবং এর বাইরে যাবার চেষ্টা করছে—সংসারের এমন ছবিতে তার প্রবর্তক ব্রহ্মসঙ্কল্পের প্রতি সুবিচার করা হয় না। মনে হয় সমস্তটা ব্যাপার যেন কারও অর্থহীন পাগলামি বা খোশখেয়ালমাত্র। কিন্তু জড়ের মাঝে ব্রহ্মের আত্মনিগূহন এবং তাহতে বিচিত্র রূপায়ণের আনন্দে ও বীর্যে তাঁর আত্মোন্মীলন, এই যদি বিশ্বলীলার তাৎপর্য হয়, তাহলে সমস্তটা ব্যাপার অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। কর্মফল, বাসনার বিলয় বা অবিদ্যার নিরসন—যাকেই জীবনায়নের মূল তাগিদ বলে ব্যাখ্যা করি না কেন, তা যদি এই আত্মোন্মীলনের অঙ্গীভূত হয়, তবেই তার সার্থকতা। কিন্তু তখন আর এগুলো শুধু নেতিবাচক ভাবনায় পর্যবসিত থাকে না। বন্ধনমুক্তির প্রয়াসের সহায়করূপে এদের সার্থকতা মেনে নিয়েও, আত্মোল্লাসের একটা বৃহৎ সম্ভাবনা চেতনার দিগন্তে তখন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কর্ম, বাসনা এবং অবিদ্যার মর্মে তখন দিব্য শক্তি সঙ্কল্প ও বিদ্যার স্ফুরন্তারই পরিচয় পাই। শুধু আত্মবিলয়কেই তখন জীবনের লক্ষ্য বলে জানি না—জানি আত্মোন্মেষই তার পরম তাৎপর্য।

অরূপ রূপী নাহলে এই উন্মেষ সম্ভব হয় না। তাই অশরীরী জীবের শরীর গ্রহণ, পুরুষের প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হওয়া। কিন্তু বস্তুত প্রকৃতি পুরুষের আবরণ নয়, আত্মশক্তির উন্মেষের সাধন। অতএব পৌরুষের বোধের স্ফুরণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতিও তার অনুগামী হয়ে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে—এই দিব্যরূপায়ণের ব্যাপারই জন্মান্তরের প্রবর্তক। প্রকৃতির এই রূপান্তরকে যদি জীবনায়নের নিয়ামক বলে স্বীকার না করি, তাহলে 'মরলেই সব ফুরিয়ে যায়'—বাস্তববাদীর এই সিদ্ধান্ত চিদ্‌বাদীর বেলাতেও কেন খাটবে না তার কোনও যুক্তি

পাওয়া যায় না। জীবসত্তের তাত্ত্বিকতা যদি না মানি, তাহলে মৃত্যুর পর জীবনের বৃহদ্‌ অচিৎ প্রাণসমুদ্রেই মিলিয়ে যাক, আর চিন্ময় ব্রহ্মসমুদ্রেই মিলিয়ে যাক—দুয়ের মাঝে কোনও তফাৎ হয় না। চিদ্‌বাদীর বেলাতেও স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, তারও 'পিণ্ডপাতেন বা মুক্তিঃ, সা মুক্তিঃ' মৃত্যু আর মুক্তি তার বেলাতেও সমার্থক, লোকান্তরস্থিতি বা জন্মান্তর কোনটাই সেক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। বস্তুত জীবসত্তের তাত্ত্বিকতা বা চৈত্যসত্তার কালগত অমৃতত্বই জন্মান্তরবাদের সত্যিকার দার্শনিক ভিত্তি হতে পারে। অবিদ্যামূল বাসনাতেই জীবের বারবার জন্ম হচ্ছে দুঃখভোগের জন্য—এ হল মোক্ষবাদী দার্শনিকের জগৎসম্বন্ধে একটা স্থূল এবং উপরভাসা বিচারমাত্র। সত্যি বলতে জীবের বাসনা নয়, ঈশ্বরের সঙ্কল্পই সৃষ্টির মত জন্মান্তরেরও প্রয়োজক, এবং অবিদ্যা তার অবান্তর সাধন হলেও মূলে আছে বিদ্যাশক্তিরই উল্লাস।

৩০

লোক-সংস্থান

মরলেই যদি সব ফুরিয়ে না যায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, মরলে পর জীব কোথায় যায়? ধর্মশাস্ত্রের নানা সিদ্ধান্ত শুনে প্রাকৃত মনে লোকান্তরের একটা সংস্কার জন্মে এবং ইহ-লোকেরই মত পরলোকেরও যে একটা ছবি আঁকে। স্বর্গ-নরকের ফলাও কল্পনা সব দেশেই আছে, কঠোর যুক্তিবাদী সেগুলোকে প্রাকৃতচিত্তের অলীক বিজৃম্ভণ বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু লোকান্তরের বর্ণচিত্রকে উড়িয়ে দিলেও তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কেননা প্রশ্নটা আত্মার অমরত্ববাদের সঙ্গে জড়িত।

লৌকিক প্রত্যক্ষবাদ দিয়ে যে আত্মার অমরত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় না, তা আমরা জানি। প্রত্যক্ষবাদের সবচাইতে বড় সাধন হচ্ছে যুক্তি। যুক্তির গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার, যুক্তি একটা স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নয়, তত্ত্বসিদ্ধির সাধন মাত্র। সব যুক্তিরই শেষ নির্ভর হল প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষাশ্রিত ভাবনা। এই প্রত্যক্ষ-ভাবনার ইতরবিশেষ হলেও সব ক্ষেত্রেই কিন্তু যুক্তির চেহারাটা এক, যদিও গোড়ার ভাবনার ইতরবিশেষে সিদ্ধান্তেরও ইতরবিশেষ হয়। একজন প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী বলেছিলেন, যাঁড়ের আর ঘোড়ার যুক্তির আকৃতি-প্রকৃতিতে কোনও তফাৎ নাই, তফাৎ রয়েছে জগৎ সম্পর্কে তাদের ধারণার অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ-ভাবনার। কথাটা খুবই সত্য।

যদি মনে করি, আমার সত্তা একান্তভাবে জড়দেহের 'পরেই নির্ভর করছে, তাহলে আমার অমরত্বকে কোনও যুক্তিতেই সিদ্ধ করতে পারব না। আমার প্রত্যক্ষ-ভাবনা এখানে

ইন্দ্রিয়াশ্রিত, যুক্তিও তাই—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বাইরে সে পা বাড়াতে নারাজ। অধিকাংশ মানুষেরই প্রত্যক্ষভাবনার ঐ সীমা। তবুও যে মানুষ সাধারণভাবে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে, এটা একটা মূঢ় এবং অর্জিত সংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। হয়তো এই সংস্কার-প্রবণতার মূলে প্রাণ ও চেতনার স্বাভাবিক একটা প্রেরণা আছে, কেননা মানবসমাজের অতি আদিম অবস্থাতেও দেখা যায়, পরলোকে বিশ্বাস লোকোত্তর শক্তিতে বিশ্বাসের মতই মানুষের মজ্জাগত। উদ্ভিদের মূঢ়ত্ব ছাড়িয়ে চেতনা যখন পশুত্বের স্তরে এল, একটা ঊর্ধ্বশক্তির অস্পষ্ট ভাবনা দেখা দিল তখন হতেই,—প্রথমত মাতৃসত্তার চেতনা থেকে। কিন্তু আত্ম-চেতনার অভাবে মরণোত্তর অবস্থার সম্পর্কে কোনও ভাবনা তখনও দেখা দেয়নি—এটি দেখা দিয়েছে মানুষের মাঝে। বলা যেতে পারে, চেতনার অন্তরাবৃত্তি (inwardisation) এবং আত্মসচেতনতার প্রতি প্রবণতা হতেই এ-ভাবনার উদ্ভব।

যুক্তিবুদ্ধি মানুষের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। যুক্তি জানাকে ভিত্তি করে অজানার দিকে তার সীমা প্রসারিত করে, এই তার ধর্ম। কিন্তু কোনও নিগূঢ় সংস্কারবশত চেতনা যদি তার বর্তমান ভূমি পেরিয়ে ঊর্ধ্বতর ভূমিতে উঠতে না চায়, তাহলে যুক্তির প্রবৃত্তি হয় শুধু একই ভূমিতে থেকে জানার সীমাকে প্রসারিত করা এবং অভিনিবেশের ফলে অন্যান্য ভূমির প্রতি উদাসীন এমন-কি বিরূপ হওয়া। আধুনিক জড়বাদের মাঝে এইধরনের একটা নতুয়ার বুদ্ধি (dogmatic attitude) আছে। জড়ের ভূমিতে যুক্তির প্রয়োগে জড়বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আশ্চর্য সিদ্ধি দেখা দিয়েছে এবং তার মোহ চেতনার অন্যান্য ভূমির প্রতি একটা অন্ধতা এনেছে। এখানে যুক্তির মূলে কাজ করছে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ-ভাবনার সংস্কার। উপনিষদের রূপক ব্যবহার করে বলা যেতে পারে, জড়বিজ্ঞান হল বিরোচন—প্রজাপতির অনুশাসনের উপরভাসা অর্থটাই সে আঁকড়ে ধরল, তার গভীরে আর ডুবতে চাইল না।

কিন্তু ইন্দ্রিয়মানস ছাড়া চেতনার আরও স্তর আছে। একেবারে যে মনের আড়াল হয়ে আছে তাও নয়। এই মনের পরেই নানাসোপানের নানা সঙ্কেত এসে পড়ে—নানা ধরনের প্রাতিভ-সংবিতের আকারে। এগুলোর ইশারা ধরে কেউ যদি অন্তররাজ্যে অভিযান চালায়, চেতনার নতুন-নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করা তার পক্ষে অসম্ভব হয় না। কিন্তু পথটা অন্তরাবৃত্তির, প্রত্যাহারের (withdrawal)। জাগ্রৎ চেতনা নিরুদ্ধ হলে স্বপ্ন ফোটে, সম্মোহিত চেতনায় অতীন্দ্রিয় অনুভবের শক্তি ফোটে, একান্ত-ভাবনায় বস্তুর গূঢ়-স্বরূপ ফোটে। প্রাকৃতভূমির এইসব অসাধারণ-প্রত্যক্ষের মূলে একই আইন কাজ করছে, সেটা আন্তরবিজ্ঞানের আইন,, এই বিজ্ঞানের অনুশীলন থেকেই যোগের উদ্ভব, যা অধ্যাত্ম-সাধনার সার্বভৌম ভিত্তি।[1] কিন্তু যোগ-বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রতি সবার হয় না—তার জন্য চেতনার পরিপাকের একটা অপেক্ষা আছে। অন্তর্মুখীনতা চিত্তের সাবালক হওয়ার

নিশানা। অমৃতত্বের পিপাসা এবং প্রাপ্তি এই পরিণত চিত্তেরই পুরুষার্থ— অন্ধবিশ্বাসীরও নয়, অবিশ্বাসীরও নয়।

দার্শনিক যাকে বুদ্ধি বলেন, প্রাকৃত চেতনাতেও যা সামান্যভাবনার (universalisation) আকারে প্রকাশ পায়, সেই অতীন্দ্রিয় সংবিত্তের ভূমিতে চেতনা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অনন্তত্বের এবং অমরত্বের একটা প্রত্যাবৃত্ত (subjective) অপরোক্ষ বোধ জন্মে।

বুদ্ধির দৌলতে সান্তের পিছনে অনন্তের সামান্য-কল্পনা প্রাকৃত মনও করে, বিশ্বের মূল খুঁজতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকও একটা অনন্ত শক্তি স্বীকার করেন। কিন্তু এই অনন্তত্বকে আত্মচৈতন্যের বেলায় খাটাতে গিয়ে স্বভাবতই প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বিধা বোধ করে, কেননা বাইরের জগতে সে দেখছে অশাশ্বত ক্ষণিকের মেলা, অন্তর্জগতেও তো দেখছে তাই। চিত্তবৃত্তি উঠছে পড়ছে, তার মধ্যে স্থায়িত্ব কোথায়? একটা অহংএর সূত্রে বিচ্ছিন্ন বৃত্তিগুলো গাঁথা বটে, কিন্তু সেই অহংকে ধরতে গেলে একটা ক্ষণিক বৃত্তি ছাড়া তো আর-কিছুই মেলে না। সুতরাং শাশ্বত আমি বলে কিছুই নাই যদি থাকে, তার কোনও নিরূপিত লক্ষণ হতে পারে না, তার অস্তিত্ব একটা সর্বাধার নাস্তিত্ব মাত্র। প্রাকৃত মনের সংস্কার আঁকড়ে থেকে অন্তরমুখে অনন্তত্বের ভাবনা যদি করি, তাহলে এই ধরণের শূন্যবাদে পৌঁছন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু এই শূন্যবাদ এখানে শুধু উজানপথের খবরই দিচ্ছে। সর্বশূন্যতার স্থিতির একটা ইতিবাচক ধর্ম আছে, সেটি হল সত্তার প্রশান্তবাহিতা। এই প্রশান্তবাহিতা সহজ হলে এরই ভূমিকায় দেখা দেয় চিৎশক্তির বীচিভঙ্গ। প্রশান্তবাহিতা যদি সহজভাবে জাগ্রতের ভূমিতেও নেমে আসে, তাহলে যে বিকল্পহীন অস্তিত্বের প্রত্যয় তার উপাদান, তার সংবেগ বৃত্তিতেও সঞ্চারিত হয়। যাকে আগে দেখেছিলাম ক্ষণভঙ্গী চিদ্বৃত্তিরূপে, তাকে তখন অনুভব করি নিত্যস্পন্দিত চিদ্বৃত্তিরূপে। যেন একটি আলোর রেখা কাঁপছে যদি বাইর থেকে দেখি, কম্পনের দুটি কূট বিচ্ছিন্ন মনে হবে, কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে অনুভব করব, দুটি কূট একই শক্তির বাঁকের দুটি প্রত্যন্তবিন্দুমাত্র। অন্তর্দৃষ্টিতে শুদ্ধ অহংএর এই চেহারা স্বরূপত সে অবিভক্ত নিত্যসম্বন্ধমাত্র, কিন্তু বিভূতিতে সে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, আবার এ-দুয়ের ঊর্ধ্বে তার অস্পন্দ স্থিতিও আছে।

বিজ্ঞানীর এই অন্তর্মুখ অনুভবই হল আত্মার অমরত্বের ভিত্তি। মনোগ্রাহ্য যুক্তি দিয়ে একে প্রমাণ করা যায় না, যে প্রত্যক্ষ অনুভবে এর প্রামাণ্য তার দিকে একটা ইশারা মাত্র করা চলে। মরণে পরেও আমি থাকব কিনা, তা এই জীবনের অনুভবকেই সূক্ষ্ম,হতে সূক্ষ্মতর করে মরণের উপান্তে পৌঁছিয়ে দিয়ে তবে বোঝা যায়। জীবন আর মরণের মাঝে শেষ পর্যন্ত দুর্লক্ষ্য একটা আলোর আড়াল মাত্র থাকে, আর সেই আড়ালের ওপার থেকে এক

মহামন্ত্রে র জ্যোতিঃপ্রপাত এসে জীবনকে বুকে তুলে নিয়ে নুছিয়ে দেয় সে অমৃত কেন। উপনিষদে তাই দেখি বৈবস্বত মৃত্যুই কুমার নচিকেতার অমৃতপিপাসার তর্পক।

প্রাকৃতবুদ্ধিকে এ-বিষয়ে একটা সঙ্কেত দেওয়া যেতে পারে। জাগ্রতের অহং সুষুপ্তিতে তলিয়ে যায়, আবার সুষুপ্তি থেকে সে বেরিয়ে আসে। এই সুষুপ্তির অহংকে যদি মানুষ বিবিক্ত করে দেখতে পারে, অর্থাৎ যদি সে জেগে ঘুমতে পারে, তাহলে প্রাকৃত জাগ্রতের সংস্কার-মুক্ত আত্মভাবের আর-একটা রূপ তার দৃষ্টির সামনে ভাসবে। ঘুম থেকে জেগে ওঠা আর মৃত্যুর পর ইহলোকে বা লোকান্তরে জন্ম নেওয়া—দুটো ঠিক এক না হলেও এক পর্যায়ের ব্যাপার। বরপোত্তর অবস্থাকে পুরোপুরি জাগ্রৎ চেতনায় গ্রাহ্য করা যায় না, কিন্তু সুষুপ্তিকে পারা যায়। যা জাগ্রতের গ্রাহ্য তাই প্রামাণিক, প্রত্যক্ষবাদীর এই দর্শনের সূত্র মেনে নিয়েই তাঁকে বলা যেতে পারে নিজের সুষুপ্তিকে জাগ্রতের গ্রাহ্য করতে। আত্ম-সত্তার গূঢ়তম প্রত্যক্ষ এবং তার শাশ্বতত্বের প্রত্যয় তখনই সম্ভব হয়। প্রত্যক্ষবাদী যদি এ-পরীক্ষা করতে নারাজ হন, তাহলে মরনেই সব ফুরিয়ে যায় বলে গোড়ামি করবার অধিকারও তাঁর থাকে না। যোগের অনেক গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে স্বপ্নবিজ্ঞান আর সুষুপ্তিবিজ্ঞানের অনুশীলন হতে। এ-দুটিকে আয়ত্ত না করলে অস্তিত্বের সকল রহস্য এবং চেতনার সকল ভূমি সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান হয় না। নিজেরই চেতনার একটা বিরাট অংশকে না মেনে কিংবা জানবার চেষ্টামাত্র না করে চেতনার ধর্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞতার ভান করা অবৈজ্ঞানিক মনো-বৃত্তিরই পরিচয়।

আত্মার অমরত্ব একটা আন্তর-প্রত্যক্ষের বিষয়, এই প্রত্যয়ের উপরেই লোকান্তরের সত্তার ভিত্তি। নৈমিত্তিক এবং আর্য দৃষ্টি ভাবনাতেই অমরত্ব স্বীকৃত বলে লোকান্তরও স্বীকৃত —দুয়ের মধ্যে তফাৎ শুধু একজন্মবাদে আর জন্মান্তরবাদে। যে-প্রত্যক্ষের উপর শাশ্বত আত্মবাদের স্থাপনা, সেই প্রত্যক্ষই লোকান্তরেরও প্রমাপক। অর্থাৎ ইহজগৎ ছাড়া আরও জগৎ যে আছে তা শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হবে প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারাই। অবশ্য এ-প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ নয়, অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়-ভাবনার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ভাবনা মিশে আছে, প্রাকৃতচেতনায় আমরা দুটোকে পৃথক করতে পারি না। প্রত্যাহার ও একতান ভাবনার দ্বারা অতীন্দ্রিয়-বোধকে জাগানো যেতে পারে, তবে তার সঙ্গে-সঙ্গে দৈহ্যচেতনার সূক্ষ্মতর বিজ্ঞানও জানা চাই। এটা আকাশকুসুমী কল্পনা নয়, রীতিমত অনুশীলনের ব্যাপার। স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে যে এই জড়ের জগতেরই সব-কিছু জানা যায় না, বৈজ্ঞানিকও একথা স্বীকার করেন। অণুচিক্ষের আইন মেনে নিয়েই অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করে দৃষ্টিশক্তিকে অসাধারণ

তীক্ষ্ণ করতে পারেন তিনি, তখন একবিন্দু মনের মাঝে একটা অকল্পিত নতুন জগৎ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও ব্যাপারটা ওইখানে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বাইরে যায় না। ইন্দ্রিয়ের শক্তির উৎকর্ষ এখানে ঘটানো হচ্ছে জড়শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু জড়কে যেমন নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে, তেমনি ইন্দ্রিয়ভাবনাকেও তো নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। কেননা, জ্ঞানের এক প্রান্তে বিষয় এবং আর এক প্রান্তে বিষয়ীর যোগাযোগে যখন জ্ঞান সিদ্ধ হচ্ছে, তখন উভয়ের শুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষ সম্ভব একথা তো অযৌক্তিক নয়। প্রাচীন নৈয়ায়িক বলেছিলেন, 'মানাধীনা মেয়শুদ্ধিঃ' অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিকে শুদ্ধ করলে প্রমেয়ের তত্ত্বও আবিষ্কৃত হয়। এই সূত্রটির পরেই সমস্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভিত্তি। জড়বিজ্ঞানের মতই তারও একটা অবিসংবাদিত প্রামাণ্য আছে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কারবার চিত্তের অন্তর্মুখবৃত্তি নিয়ে,—ঐ হল তার মুখ্য সাধন। অন্তর্মুখ-বৃত্তির ব্যাপার প্রাকৃত চেতনাতেও আছে। তার একটা ধারার সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত, তাকে বলি 'কল্পনা'। কল্পনা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে বলে তাকে আমরা প্রত্যক্ষের চাইতে খাটো করে দেখি। প্রত্যক্ষবাদী বলবেন, তোমার লোকান্তরও একটা কল্পনা। খৃষ্টী-বিশ্বাসীদের বেলায় কথাটা যে সত্য তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু অন্তর্জগৎটা তো শুধু কল্পনা দিয়ে তৈরী নয়, তার মধ্যে আর-একটা বৃত্তি কাজ করছে যাকে বলতে পারি 'ভাবনা'। কল্পনা বাইরের বস্তুকে অন্তরে এনে ছাড়িয়ে করে, ভাবনা তার অর্থ আবিষ্কার করে। এই অর্থটা সবসময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; গীতার ভাষায় বলা যেতে পারে, তার একটা ঝোঁক রয়েছে 'বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়ের' দিকে। প্রত্যেকের কল্পনার সঙ্গে ভাবনা সূক্ষ্মভাবে জড়িয়ে আছে, তাকে নিষ্কাশিত করতে পারলে অধ্যাত্ম অণুবীক্ষণের কাছে আর-একটা জগৎ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। এইটিই যোগী এবং মরমীদের অতীন্দ্রিয় জগৎ।

এই আবিষ্ক্রিয়ার সূত্র কিন্তু আমাদের আটপৌরে প্রত্যক্ষের মাঝেই রয়েছে। তাদ্বারা-বিজ্ঞানের আলোচনার বেলায় দেখেছিলাম, বিষয় আর বিষয়ীর মাঝে সন্নিকর্ষ যতই নিবিড় হতে থাকে, ভেদদর্শন ততই অভেদদর্শনের দিকে এগিয়ে চলে, অবশেষে সব জানাই রূপান্তরিত হয় 'হয়ে জানায়'। অন্তর্মুখ ভাবনার এইটি হল সদর রাস্তা—এই রাস্তা ধরেই সে অতীন্দ্রিয় ভাবের রাজ্যে পৌঁছয়। অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজে হয় না। বাইরের দিক থেকে চিত্তের মোড় অন্তরের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে সব সময় সব অবস্থাতে 'আপনাতে আপনি থাকবার' অভ্যাসটা হল এ-সাধনার প্রথম সোপান। অন্ধকার ঘরে এসে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর অন্ধকার তরল হয়ে ঘরের ভিতরের ছবিটা যেমন ধীরে-ধীরে চোখের সামনে ফুটে ওঠে, অন্তরের নিত্য বাসিন্দা হবেও তাই হয়। এই সঙ্গে আর-একটি জিনিষের দরকার, নিজেকে সম্পূর্ণ ফাঁকা করে দেওয়া। বিষয়ের ধাক্কায় চিত্ত বাইরের দিকে ছুটে যায়,

তাইতে বিষয়ের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান হয়—এটা চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তি। কিন্তু বিষয়কে ছুঁয়েই চিত্ত যদি প্রতিমুহূর্তে কেবল অন্তরে গুটিয়ে গিয়ে শূন্য হয়ে যায় তাহলে সেটাই হবে অতীন্দ্রিয়-সাধনার আর-একটি সোপান। যোগীদের ভাষায়, আত্মস্থিতি আর স্বরূপশূন্যতা হল অতীন্দ্রিয় ভাবনার দ্বার।

এই ভাবনায় প্রথম যা আবিষ্কৃত হয়, তা আত্মচৈতন্যেরই কতকগুলি গভীর স্তর। আর এই আত্ম-আবিষ্কার হতেই আবিষ্কৃত হয় লোকান্তর। তাই লোকান্তর প্রত্যক্ষের দুটি ধারা—একটি প্রত্যক্-বৃত্ত (subjective) আর-একটি পরাক্-বৃত্ত (objective)। প্রত্যক্‌বৃত্ত প্রত্যক্ষে নিজের মাঝেই অতীন্দ্রিয় জগতের চিন্ময় উপাদানগুলির দেখা পাওয়া যায়—বিশুদ্ধ জড়, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ, চিৎ ও সত্তার ভাবঘন স্বগত প্রত্যয়রূপে। তারপর এই প্রত্যয়ের পরিপাকে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মচৈতন্যকে কেন্দ্র করেই পরাক্ দৃষ্টিতে অনুভূত হয় লোকান্তরের পরম্পরা। প্রাকৃতভূমিতেও আত্ম-চৈতন্যের মধ্যবিন্দু হতেই বিচ্ছুরিত হয় লোকচৈতন্যের পরিমণ্ডল। আমার আমিকে কেন্দ্র করেই আমার জগতের বিস্তার। আমি শুধু আমার মধ্যে গুটিয়ে থাকি না, স্বরূপ-বিস্ফূর্তির উল্লাসে বাইরেও ছড়িয়ে পড়ি। চিৎশক্তির এই ব্যাপ্তিধর্মই লোকসৃষ্টির কারণ। চিৎ যদি একটা একরস তত্ত্ব হত শুধু, তাহলে সৃষ্টিও হত না, লোকও দেখা দিত না। কিন্তু চিত্তের মাঝে আছে একটা স্বগত-পরিণামের লীলা, আত্মবিভাবনার (self-modification) একটা স্ফূরত্তা। এক আমার মাঝেই সংহত হয়ে আছে অনেকগুলি আমি—চিৎ-পরিণামের নানা স্তর আশ্রয় করে। এই বিভিন্ন 'আমি'-গুলির স্বতন্ত্র সংস্ফূর্তির জন্যই দরকার হয় লোকের। লোক-ভাবনা দাঁড়িয়ে আছে তিনটি নিমিত্তের উপর—দেশ, কাল আর সম্বন্ধ। বহুর প্রত্যেককে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দেবার জন্য দরকার হয় দেশের, প্রত্যেককে আত্মপরিণামের অবকাশ দেবার জন্য দরকার হয় কালের, আর পরিণামের ক্রিয়া অগ্রসর হয় মনোনামসম্বন্ধকে আশ্রয় করে। এমনি করে জগৎ গড়ে উঠছে—কি আমার অন্তরে, কি আমার বাইরে। ইহলোকের বিন্যাস যে-ধারায়, লোকান্তরের বিন্যাসও সেই ধারাতে, দুয়ের মাঝে তফাৎ শুধু উপাদানগত বিভিন্নতায়। আর সে-বিভিন্নতাও দেখা দেয় একই অন্বয়তত্ত্বের ক্রমসূক্ষ্ম পরিণামে।

উপনিষদে একটা কথা আছে, 'এখানে যা আছে তা ওখানে আছে, ওখানে যা আছে তা আছে এখানেও'। বিভিন্ন লোকের মাঝে এই সম্পর্ক, তারা ওতপ্রোত। প্রথমেই মানতে হবে, আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই সব নয়, এমন-কি আমাদের আটপৌরে চেতনার বেলাতেও নয়। এই প্রত্যক্ষ জগৎটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা অপ্রত্যক্ষের জগৎ—তাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে পাই না, পাই বোধে। স্বভাবতই বোধটা নিজের বেলায় স্পষ্ট

হলেও পরের বেলায় আবছা। আমার বস্তুজগৎ আমার ইন্দ্রিয়ের গোচর, কিন্তু আমারই ভাবজগৎ আমার কাছে অতীন্দ্রিয় অথচ বুদ্ধিগ্রাহ্য। পরের ভাবজগৎ আমার কাছে অনুমানের বস্তু। তবুও দেখি, যেখানে ভাবের সাদা সেখানে পরচিত্তেরও খানিকটা প্রত্যক্ষবোধ হতে পারে। একে সূত্র ধরে যদি চিত্তের অন্তরাবৃত্তির দ্বারা ভাবের অনুশীলন করা যায়, তাহলে আমার চিত্তের মত অপরের চিত্তও আমার প্রত্যক্ষ হতে পারে। এই বোধিজ প্রত্যক্ষই লোকান্তর-বিজ্ঞানের করণ। যেমন সুষুপ্তির বিনিদ্র প্রত্যক্ষ হতে শাশ্বত আত্মসত্তার বিজ্ঞান সম্ভব হয়, তেমনি পরের সঙ্গে প্রাণ মিশিয়ে পরের মন জানতে পারলে লোকান্তর-বিজ্ঞানের পথও খুলে যায়। তারও গোড়ার কথা হল, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে বস্তুর প্রত্যয় যেমন সাদা বেঁধেছে তেমনি অন্তর্জগতে ভাবগুলোকেও সাদা বাঁধতে শেখা, যাতে তারা রূপসৃষ্টিতে সক্ষম হয়। প্রাকৃত কবিচিত্ত এটা খানিকটা পারে, যোগীর অপ্রাকৃত চিত্ত বিশ্বযোগে যুক্ত হয়ে হয় লোকবিৎ এবং লোককৃৎ। অবশ্য এটা অনেক দূরের কথা। কিন্তু সেই সুদূরের পথ যে আমাদের প্রাকৃত চিত্তের আঙিনা হতেই শুরু হয়েছে—এইটে বোঝাবার জন্যই এত কথা বলা।

সংশয়ী তবুও বলবেন, এমনও তো হতে পারে লোকসংস্থান মনের একটা কল্পনা, কিংবা এগুলো সত্য হলেও এই মনই উজানপথে এদের সৃষ্টি করে চলেছে। প্রাকৃত মনের আঁকা স্বর্গ-নরকের ছবি যে অনেকখানিই কল্পনা তা আগেও বলেছি। প্রাকৃত মন ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না, লোকান্তরের কল্পনায় তাকে প্রসারিত করে মাত্র। কিন্তু যে-ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হতে কল্পনার সৃষ্টি, তারও মাঝে একটা গভীরের দিক আছে, স্মৃতি-নির্ভর কল্পনা তার আশ্রয় নয়। একটা ফুল দেখে ভাল লাগল, স্বভাবতই এই ভাল-লাগাটা জিইয়ে রাখবার ইচ্ছা আমার হবে। সাধারণত দু'উপায়ে এই রসাস্বাদকে পুলকিত করতে পারি—বারবার ফুলটাকে দেখে, কিংবা তার স্মৃতিকে লালন করে। দুটি ব্যাপারই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখছে এবং তাদের ক্রিয়া হচ্ছে চিত্তের উপরের স্তরে মাত্র। অনেক অনুকূল বোধ আমরা এই ভাবেই জিইয়ে রাখি—এটা হল পুনরাবৃত্তির পথ। কিন্তু এতে বোধের স্থায়িত্ব এবং গভীরতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। আবর্তনের বেগটা কিছুকাল পরে হয়তো মন্দা হয়ে পড়ে, বোধও ক্রমে মিলিয়ে যায়; কিংবা অন্তরে বোধের একটা অস্পষ্ট সংস্কার মাত্র থাকে, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে খানিকটা ধূসর অতৃপ্তি। কিন্তু এমনও হতে পারে, ভাল-লাগাটা অন্তরের গভীরে একটা কিছুকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিল, শুরু হল চিত্তের অন্তর্মুখ পরিণাম, দার্শনিক যাকে বলেন 'আত্মিক বিকাশ'। তখন অন্তরের অনুভব আর কল্পনাশ্রয়ী নয়, ইন্দ্রিয়ের দেওয়া উপর-ভাসা অর্থের গভীরে সে আর-একটা অর্থকে আবিষ্কার করেছে। এই অর্থের ইঙ্গিত বস্তুর শাশ্বত স্বরূপের দিকে, যা শেষ পর্যন্ত

পর্যবসিত হয় চিদ্‌বিলাসের অনুভূতিতে। অধ্যাত্মযোগীর লোকপ্রত্যক্ষ চিত্তের অন্তরাবৃত্তিকে আশ্রয় করে এমনিতর একটা অতীন্দ্রিয় আবিষ্ক্রিয়া, কল্পনামাত্র নয়।

তারপর মনই লোকপরম্পরা সৃষ্টি করছে একথা সত্য হত, যদি জানতাম সৃষ্টির মূলে আছে জড়শক্তির প্রবর্তনা। তাহলে বলতে পারতাম, জড় হতে যেমন প্রাণের উন্মেষ এবং প্রাণ হতে মনের উন্মেষ হয়েছে, তেমনি এই মনেরই ক্রিয়ার মানসোত্তর লোক গড়ে উঠছে। বাইরের দিক থেকে দেখলে এমনটা মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়, কেননা সাধারণত অপরা-প্রকৃতির ক্রিয়াই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হল পরিণামের ধারা নিয়ে নয়, তার মূলে কার প্রবর্তনা তাই নিয়ে। জড় কেন জড়ই থাকল না, প্রাণ হতে চাইল কেন—তার রকমারি জবাব হতে পারে। কেউ বলবেন, জড় প্রাণ হয়েছে যদৃচ্ছার (chance) বশে, কেউ বলবেন নিয়তির (necessity) বশে কেউ বলবেন, হওয়া তার স্বভাব তাই হয়েছে, কিংবা কালক্রমে হয়েছে। এ জবাবগুলোর কোনটাই কিন্তু প্রশ্নটার গোড়ার দিকে ঘেঁষছে না, প্রবৃত্তির নিপুণ ব্যাখ্যা দিয়েও প্রবর্তকের কথাটা এড়িয়েই যাচ্ছে।

একটা কথা মানতে হবে, প্রাণ জড়ের চাইতে উৎকৃষ্ট তত্ত্ব। শুধু প্রবৃত্তির দিক থেকে দেখতে গেলে, এখানে নিকৃষ্ট তত্ত্ব হতে উৎকৃষ্ট তত্ত্বের আবির্ভাব হচ্ছে, সুতরাং নিকৃষ্ট তত্ত্ব প্রাগ্‌ভাবী এবং উৎকৃষ্টতর পরভাবী। কিন্তু নিকৃষ্টতরের প্রাগ্‌ভাব প্রবৃত্তির বিচারে একটা অবিসংবাদী তথ্য হলেও এ তার কৌলীন্য বাড়ায় না। নিকৃষ্টের মাঝে উৎকর্ষের প্রবৃত্তি সঞ্চারিত করছে যে-শক্তি এবং কালক্রমে তার প্রশাস্তাও হচ্ছে, সত্যিকার মর্যাদা কিন্তু সেই শক্তিরই। প্রবৃত্তির বিচারে সে পরভাবী, তবু প্রবর্তকের বিচারে সে প্রাগ্‌ভাবী। তার প্রাগ্‌ভাব ব্যক্ত নয়, অব্যক্ত—এই কথা স্বীকার করলে দুটি তত্ত্বেরই মর্যাদা থাকে এবং আবির্ভাবের তত্ত্বও প্রাঞ্জল হয়। চিৎ যদি পরমতত্ত্ব হয়, তাহলে জড়ের মাঝে প্রবর্তক শক্তিরূপে নিগূঢ় থেকেই তাকে আশ্রয় করে সে উন্মেষিত হচ্ছে—এই দৃষ্টিই সমীচীন। চিৎকে পরমতত্ত্ব বলছি এইজন্য যে আমার সার্থক অস্তিত্বের পক্ষে সে অপরিহার্য; আমার চেতনা যেমন নিজেকে জানছে তেমনি জড়কেও জানছে, জড়ত্ব অন্ধ বলে কিছুই জানছে না। তবে সঙ্গে-সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে, চেতনা যে শুধু উদাসীন দ্রষ্টৃত্ব তা নয়, তাতে রয়েছে স্ফুরত্তা এবং সম্ভূতির প্রবেগ।

অন্তর্দৃষ্টিতে চেতনাই স্ফুরত্তা, প্রাক্তন তত্ত্ব, তার স্ফুরত্তাতেই লোকসংস্থানের বিসৃষ্টি হচ্ছে। এই স্ফুরত্তাতে সংকোচ এবং প্রসার দুটি ধর্মই আছে। চেতনার আত্মনিগূহনে জড়ের সৃষ্টি, আবার আত্মপ্রসারণের প্রবেগে জড়ের চেতনায় ফিরে যাওয়া—এই দুটি নিয়েই বিশ্বলীলা। অখণ্ডদৃষ্টিতে দুটি ব্যাপারই চিদ্‌বৃত্তি, অর্থাৎ জড়ের চিন্মুখী গতি যেমন সত্যতন,

চেতনার অভাভিমুখী গতিও তাই। আবার দুটি ব্যাপারের মাঝে পৌর্বাপর্য নাই, আছে যৌগপদ্য—শক্তির ঘনীভাব এবং বিস্তার দুটি একসঙ্গেই ঘটছে। এমন কি প্রাকৃত চিত্ত-বৃত্তিতেও দেখছি, ডুবিয়ে যাওয়া এবং ছড়িয়ে পড়া যে একসঙ্গে চলছে, আত্মসচেতনতার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে তা অনায়াসেই ধরা পড়ে।

চিৎকে বিশ্বমূল মানলে লোকসংস্থানকে আর মনের সৃষ্টি বলতে পারি না,—বলতে হয়, ওটি প্রাকৃসিদ্ধ তত্ত্ব, মন তার আবিষ্কারক মাত্র। অবশ্য মন বলতে ইন্দ্রিয়নির্ভর মনকে লক্ষ্য করছি না, লক্ষ্য করছি অধিচেতন মনকে।

লোকসংস্থানের একটা প্রাচীন ছক হল সপ্তব্যাহৃতিতে উল্লিখিত সপ্তলোক, উপনিষদে যাদের বলা হয়েছে 'আপঃ'। আমাদের সত্তার সপ্ততত্ত্বের সঙ্গে এই সপ্তলোকের একটা সমান্তরতা আছে, কেননা আগেই বলেছি আত্মচেতনা আর লোকচেতনা একই চিৎশক্তি প্রত্যক্ এবং পরাক্ বিভঙ্গমাত্র। লোকসৃষ্টিতে যা সত্য তপঃ জন মহঃ স্বঃ ভুবঃ এবং ভূঃ, প্রজার অনুভবে তাই সৎ চিৎ আনন্দ বিজ্ঞান মন প্রাণ এবং দৈহাচেতনা। সবই এক অখণ্ড চৈতন্যের বিকাশ—জীবের আকারে এবং জগতের আকারে। জীবে-জীবে জগতে-জগতে এবং জীবে-জগতে একটা অঙ্গাঙ্গিভাব আছে, কেননা সবাই তারা একই বিরাটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এর মধ্যে ঊর্ধ্বতর অবরতত্ত্বের নিয়ন্তা এবং অবরতত্ত্ব তার আত্ম-রূপায়ণের আশ্রয়। ঊর্ধ্বলোকের শক্তি অবরলোকে আবিষ্ট হয়ে তার রূপান্তর ঘটিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে—যেমনটি ঘটছে দেখছি জীবদেহে। পিণ্ডে (microcosm) যা ঘটছে, ব্রহ্মাণ্ডেও (macrocosm) তাই ঘটছে।

প্রাকৃত মানুষে মনশ্চেতনা পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে, চেতনার আর চারটি স্তরের ক্রিয়া তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। প্রচ্ছন্নকে প্রকট করবার সাধনাই জীবনায়ন। তার জন্যই আধার-শক্তির অবাঙ্ মনসগোচর রূপান্তর চাই। চেতনার স্তরগুলিকে বিশুদ্ধ শক্তিরূপে যদি দেখি, তা হলেই লোকভাবনার সূত্র পাই। তোমার-আমার দৈহাশক্তির প্রকাশ ও প্রবৃত্তির মূলে যে অন্নময় শক্তি (spiritual-mental energy) বিরাট উৎস, তাই ভূ-লোক। জড়ের জগৎ এবং জড়াশ্রিত জীবন তারই বিভূতি। আমাদের পৃথিবী তারই অন্তর্গত। পৃথিবীতে যে তিনটি লোকের ক্রিয়া আপাতত স্ফুরিত হয়েছে, তাদের মধ্যে একটা ব্যাবিশ্রভাব আছে, একটা সংঘর্ষ আছে—যেমন আছে আমাদের দেহে প্রাণে মনে। শক্তির যেমন অবিচ্ছেদ আছে, তেমনি বিচ্ছেদও থাকতে পারে। তাকে আশ্রয় করেই চিৎশক্তির ভূরুভূনিব পরম্পরা। তাই সপ্তলোক বা 'আপঃ'। এইসব বিভূতির মধ্যে অযৌক্তিক কিছুই নাই, প্রাকৃত চেতনার প্রকৃতি এবং প্রয়াস হতেই এগুলো স্বচ্ছন্দে অনুমান করা চলে। অনুমানকে প্রত্যক্ষে পরিণত করা সাধনার দায়।

চেতনা যখন মনের ভূমি ছাড়িয়ে বিজ্ঞানভূমিতে উত্তীর্ণ হয়, আত্মার অমরত্ব এবং লোকান্তরের তাদিকতা তখনই প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে। এই প্রত্যক্ষকে ভিত্তি করে জীবের সংসারগতির একটা ছক আঁকা যায়। আসি জন্মান্তরভাবনাকে স্বীকার ক'রে এখন আমরা তাই করব।

[ক্রমশঃ]

নির্ভর

নিশিকান্ত

অভ্রভেদী-অস্মিতার অতিকায় বনস্পতিদল
প্রবল ঝঞ্ঝায় যবে পতন-শঙ্কায় হতবল,

মৃন্ময়ী মায়ের কোলে নির্ভরের নম্র দূর্বারাশি
তখন আনন্দে হাসে প্রভঞ্জন-বিজয়ের হাসি।

সূর্যমুখী

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়

কুঁড়ির কপোলে লাগে রক্তিম কুঙ্কুম,
একটি চুম্বনে তার নিদ্রা যায় টুটি';
তোমার সৃষ্টির মাঝে আমি যে কুসুম,
একটি প্রার্থনা সম শুধু ফুটে উঠি।

তুমি সূর্য চিরন্তন আমি সূর্যমুখী,
অন্তর বহ্নির শিখা একনিষ্ঠ জ্বলে—
তব পানে অহর্নিশি আমি যে উন্মুখী
মেলিয়া রেখেছি মোর স্বর্ণ-মর্মদলে।

লহ তারে তব করে কর পূর্ণতর,
তোমার বহ্নির বর্ণে উঠুক উজ্জ্বলি'
তোমার সৌন্দর্যে হোক সকলি সুন্দর,
আঁধার রজনী বক্ষে তারার অঞ্জলি।

ঊর্ধ্বের আকাশে তুমি দীপ্ত রবি,
মর্ত্যে বহি' তব বার্তা—আমি তব কবি।

-2005

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বার্তিকা

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও দর্শন বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির পাঠমালা

পাঠমালা সিরিজ

১। মা	শ্রীহরিদাস চৌধুরী	
২। চেতনার অবতরণ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৲
৩। শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ	শ্রীঅনিলবরণ রায়	১৲
৪। পঁচিশ প্রদীপ (কাব্যগ্রন্থ)	নিশিকান্ত	২৷৷০
৫—৭। মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৩৷৷০
৮-১০। শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ	শ্রীঅনিলবরণ রায়	২৲
১১। এ-যুগের সাধনা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৷৷০
১২। কে এই মা ?	পণ্ডপতি	৷৷০

শ্রীঅরবিন্দ

দিব্য-জীবন (দুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম খণ্ড ৮৲ ; ২য় খণ্ড ১৪৲
ভারতের নবজন্ম ১৷৷০
কর্ম্মযোগী ১৷৷০

শ্রীমা

ছোটদের গল্প
পুরাণো লেখা
শিক্ষা
মায়ের আলাপ
ভাবী-কালে

উপস্থাচতুষ্টয় ও মুক্তিচতুষ্টয়